31254
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
9

# শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেবের
## স্মৃতি অর্চ্চনা।

9/324
PRESENTED
LIBRARY
No.... 9/324
Sri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS

শ্রীচরণ সম্বল—

শ্রীশুভময় দত্ত, এম্. এ., বি. এল.
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ও এডভোকেট (নোয়াখালী)

কর্তৃক নিবেদিত

# শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেবের
## স্মৃতি অর্চ্চনা।

PRESENTED

LIBRARY
No. 7/324
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীচরণ সম্বল—

শ্রীশুভময় দত্ত, এম. এ., বি. এল.
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ও এডভোকেট (নোয়াখালী)
কর্তৃক নিবেদিত

মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রকাশক—
শ্রীশুভময় দত্ত
১/৬০, গর্চ্চা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-১৯
ফোন ঃ  ৪৬-৪৭৫৪

মুদ্রাকর—
শ্রীমতী নীহারকণা সুর রায়
মণিকা প্রেস
৪০, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯
ফোন ঃ  ৩৪-২৫৩৮

বাইণ্ডার—
শ্রীদেবেন্দ্র লাল বসাক
সেঞ্চুরী বাইণ্ডিং কোং
৪৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান—
১। প্রকাশক, ১/৬০ গর্চ্চা ফার্স্ট লেন
কলিকাতা-১৯
২। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর
কলিকাতা-৩২
৩। ‘জীবামৃত ঔষধালয়’
১/৫, বিজয়গড় (যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের সামান্য দক্ষিণে)।

PRESENTED
LIBRARY
No.... 9/৩২৮
Shri ...
BANARAS

# ভূমিকা

এই পুস্তকখানার আরম্ভেই দৃষ্টতঃ যাঁহার সস্নেহ প্রেরণায় ইহা লিখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানার পাণ্ডুলিপি লেখা ও ছাপার কার্য্য শেষ হওয়ায় আজ সেই মহানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীশিশির কুমারের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিতেছি। পুস্তকখানার দ্বারা অন্য কাহারও উপকার হইবে কি না, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন কিন্তু ইহার প্রণয়নে গত কয়েকমাস অনেক সময় তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমার মনে জাগ্রত হওয়ায় যে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যদিও আমার প্রণীত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব স্মরণে" নামক গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও আশ্রমাদি সম্পর্কে স্বভাবতঃই স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই পুস্তকে বহু নূতন তথ্য ও অলৌকিক ঘটনাও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, "বেদবাণী" অংশে উভয় পুস্তকেই বিষয়বস্তুভেদে পত্রের শ্রেণী বিভাগ প্রায় একই প্রকারের করা হইলেও, প্রত্যেক পুস্তকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পত্রাবলী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে উভয় পুস্তকের পাঠক পাঠিকাগণই একই বিষয়ে সমাধানের জন্য পুস্তক দুইটি পড়িয়া অধিকতর উপকৃত হইতে পারিবেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে, ইহা উল্লেখ করা সঙ্গত যে, "মণিকা প্রেস"এর ম্যানেজার, শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সুর রায় মহাশয় আমার প্রতি অহৈতুকী শ্রদ্ধাবশতঃ এই পুস্তক অতি তৎপরতার সহিত মুদ্রিত করায় আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া যাঁহারা এই পুস্তক ছাপান সম্পর্কে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বার্ধক্যবশতঃ আমার নিজহাতে লিখিতে খুবই কষ্ট হয়, সুতরাং এই পুস্তকের আনুমানিক মাত্র এক চতুর্থাংশ পাহাড়তলী শ্রীশ্রী-কৈবল্যধামে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট আমার বাসস্থানে বসিয়া স্বহস্তে লিখিয়াছি। আর বাকী সমস্তই আমার কন্যা শ্রীমতী স্মৃতি দত্ত (রানু) এম, এ, ও শ্রীমতী শান্তি দত্ত (মণ্টু) বি, এস, সি, বি, এড, এবং দৌহিত্রী শ্রীমতী শিখা (ইবু) ও অনুরাধার (ছোটন) দ্বারা আমি নিজমুখে আস্তে আস্তে বলিয়া বলিয়া লেখাইয়াছি। আমার কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী বসু (শেফু) এম, এ, এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত দেখিয়া বর্ণাশুদ্ধিআদি সংশোধন করিয়া ও আমার জামাতা শ্রীমান নৃপেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ, এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইহারা সকলে সানন্দে ঐ সকল কাজ না করিলে এ পুস্তক প্রকাশে অনেক গৌণ হইত সন্দেহ নাই। এতদব্যতীত আমার কন্যা শ্রীমতী শোভা ও শ্রীমতী চিন্ময়ী এবং আমার পুত্রগণ সকলেই আমার উভয় পুস্তক প্রকাশ করার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। একটু সঙ্কোচের বিষয়

৭/৩২৭



হইলেও, কর্ত্তব্যানুরোধে উপরোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

উক্ত উভয় পুস্তক ছাপান সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাল্যকাল হইতে আমার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন আমার পরম আত্মীয় স্নেহাস্পদ শ্রীমান অরুণচন্দ্র রায়, বার, এট, ল', আন্তরিকভাবে সর্ব্বপ্রকারে আমাকে উৎসাহিত না করিলে আজ পর্য্যন্ত এই দুইখানা পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

উপরোক্ত আত্মীয় স্বজন যেন সকল সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি উন্মুখ থাকিয়া পরম শান্তিতে ও আনন্দে কাল কাটাইতে পারে এবং এই পুস্তক দুইখানি প্রচারে আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য যেন সফল হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে এই প্রার্থনা করিয়া এই পুস্তকখানার ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম।

তারিখ ঃ
২২শে জানুয়ারী ১৯৬১ ইং
৮ই মাঘ ১৩৬৭ বাং

গ্রন্থকার
শ্রীশুভময় দত্ত

# সূচীপত্র


| বিষয় | | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারাদি | ... | ১— ২২ |
| ২। তাঁহার সমভাব, নিরপেক্ষতা, মাধুর্য্য, ভক্তবাৎসল্য ও অসীম শক্তি | ... | ২৩— ৯০ |
| ৩। জন্মোৎসব ... | ... | ৯০—১০৪ |
| ৪। আশ্রম পরিকল্পনা ও পাঁচটি আশ্রম | ... | ১০৫—১৬১ |
| ৫। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... | ... | ১৬২ |
| ৬। তাঁহার উপদেশাবলী ... | ... | ১৭৫ |

LIBRARY
No............
S... Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS

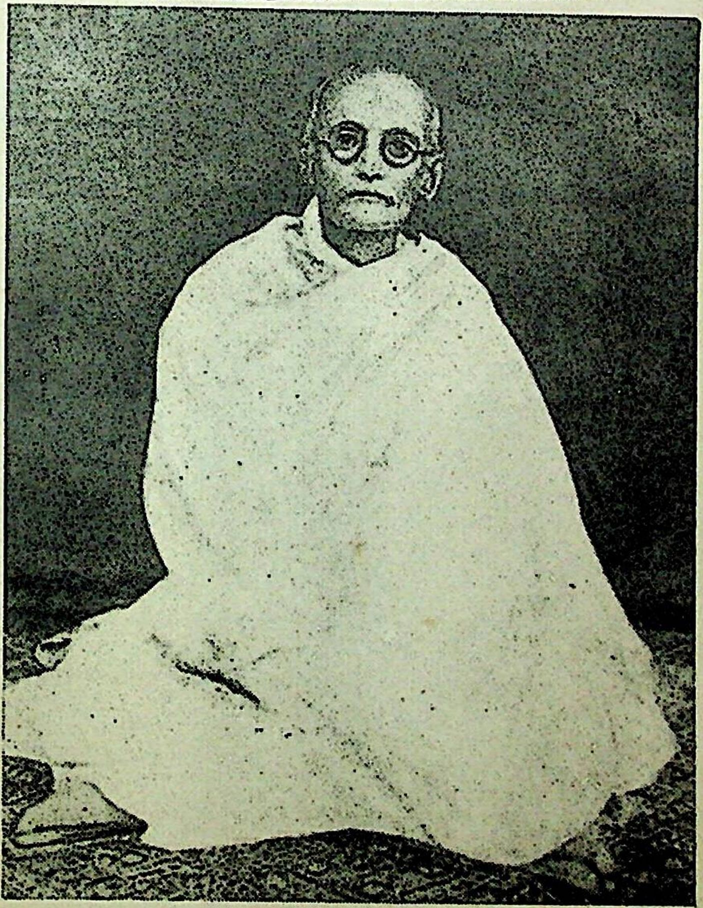

## শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেবের

# স্মৃতি অর্চ্চনা

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় আমার প্রণীত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব স্মরণে" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ হওয়ার পর যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহু বৎসর ধরিয়া মৌনী বিখ্যাত "শ্রীসুদর্শন" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশিশির কুমার ব্রহ্মচারী মহোদয় অন্যতম। জানিনা কেন, তাঁহার দর্শন পাওয়ার প্রথম দিন হইতেই তিনি নানাপ্রকারে আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার উপদেশাবলী সম্পর্কে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রায়তনে এবং কম মূল্যের পুস্তক ছাপাইলে জনসাধারণের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। তাঁহার এই নির্দ্দেশেই উৎসাহিত হইয়া আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার দেহত্যাগের আনুমানিক পাঁচ/ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে মাঝে মাঝে আমাদিগকে উপদেশ প্রদানের পরে বলিতেন, "আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। আমি উপদেষ্টা নই, আমি দৃষ্টান্ত মাত্র।"

এই কয়েকটি কথা কেন তিনি বলিতেন, এ বিষয়ে, আমি অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি। বিশেষতঃ তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর হইতে অলক্ষিতে তাঁহার নির্দ্দেশেই হয়ত তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত

ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ্. ডি. যখন বেদবাণী সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ ভক্তগণের বিভিন্ন সময়ের লিখিত পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত পত্রের যে যে অংশ মানবমাত্রেরই মঙ্গলজনক হইবে বিবেচনায় ছাপাইতে লাগিলেন, তখন হইতেই বারংবার ঐ বেদবানী পড়িতে পড়িতে আমার ঐ চিন্তা আরও প্রবলতর হইতে লাগিল। বেদবাণীর পত্রগুলি যতই গভীরভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে পড়িতেছি ততই আমার মনে হইতেছে যে, তাহাতে যে সকল উপদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে তদপেক্ষা সাধনার বা ঐহিক ও পারত্রিক শান্তি ও আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়ার আর কোন সহজ অথচ প্রকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপদেশ কিছুই নাই।

এমতাবস্থায় কেন যে তিনি উপদেশ দেওয়ার পর উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেন তাহা আমার মনে বারংবার উদয় হওয়ায়, বহু চিন্তার পর আমার অতি সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল তিনিই জানেন আমার এই ধারণাগুলি ঠিক কিনা।

যদিও তিনি আধ্যাত্মিক চরম উন্নতির, শান্তির ও আনন্দের পথই পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারীর পক্ষে ঐ গভীরার্থব্যঞ্জক উপদেশগুলি এতই কঠিন যে তাহার মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ। বহুবার পড়িতে পড়িতে যদি কিছুটা প্রকৃত সত্য উপলব্ধিও হয়, ঐ সত্যানুসরণে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তাহা আমাদের বিন্দুমাত্রও নাই। সেইজন্যই হয়ত তিনি ঐ অতি সহজ ও

মাধুর্য্যময় উপদেশ অপেক্ষাও সহজতর আত্মোন্নোতির পন্থা তাঁহার আচরণ দ্বারা পরোক্ষে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তাঁহার সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা যেন ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেইজন্যই হয়ত তিনি মাঝে মাঝে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

আমাকে এযাবৎ তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার আচরণ সম্পর্কে যাহা লক্ষ্য করার সুযোগ বা শক্তি দিয়াছেন আমি তাহাই লিখিতেছি। যদিও আমি বুঝি যে, তাঁহার ন্যায় অচিন্ত্যনীয়, অসীম শক্তিশালী, প্রচ্ছন্ন, সচ্চিদানন্দ, প্রকট বিগ্রহের আচরণ আমার ন্যায় অতি নিম্নাধিকারী খুব সামান্যই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছে, তত্রাচ ঐ সামান্য উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দ্বারা যদি কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার হয় তাহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একই কাম্‌রায় দিবা-রাত্র অনেক দিন যাপন করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যহই আমি শয্যা ত্যাগ করার পূর্ব্বেই তিনি মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপন করিতেন। অতি প্রত্যূষে যখন আকাশে তারা দেখা যাইত, তখন প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া সময়ে সময়ে ঘরেই অপেক্ষা করিতেন এবং কোন কোন দিন বাহিরে দাঁড়াইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেন, কিন্তু কখনও ঘুম হইতে জাগাইতেন না কিংবা তাড়াতাড়ি আসিতেও বলিতেন না। বাড়ীর কম্পাউণ্ডের বাহির হইয়া কোন্‌দিকে যাইবেন তাহাও অনেকদিনই জিজ্ঞাসা করিতেন। তৎপর বহুদূর ভ্রমণ করিয়া পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে বাড়ী ফিরিতেন।

তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে যখন শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু তিনি কখনও ঘরের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন না, তখনও ঘরের বারান্দায় সময় সময় কাঠের রেলিং ধরিয়াও বেড়াইতে দেখিয়াছি। ইহার দ্বারা আমি এই বুঝিয়াছি যে, সকলের পক্ষেই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। ঐ সময় মনে মনে প্রতি পদক্ষেপে ইষ্ঠনাম জপ করিলে আরও বেশী সুফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বেড়াইতে যাইতে সঙ্গীয় ব্যক্তিগণের মত লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা ঐ ভাবে আমার ন্যায় তাঁহার দাসানুদাসেরও মত গ্রহন করায় কেবল দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও চলা-ফেরা কিংবা আহার-বিহার কোনও বিষয়েই আমাদিগকে কোনও নির্দ্দেশ দিতেন না অথবা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে কখনও বাধা দিতেন না। তাঁহার আচরণই ঐসকল বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপদেশ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত। কোনও ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছিলেন, "কৃষ্ণের পুত্রাদি যদু বংশকে তাহাদের প্রকৃতির ভোগের নিমিত্ত নিষেধ বিধান কৃষ্ণ হইতে হয় নাই। তাদের প্রবৃত্তির উৎসুকের কর্ম্ম সর্বথাই করিয়াছিল। যথাসময়ে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ যদুবংশীয়গণ নিশ্চয় কৃষ্ণই কর্ত্তা জানিত, এইজন্য তাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিলনা। ইহাই সাধন। আত্মাই দেহের কর্ত্তা, প্রারব্ধ ভোগই দেহের কর্ম্ম, এই জ্ঞানে অভিমানী হইয়া অতি দুরাচারীও নিত্যমুক্তি লাভ করিতে পারে।" ( বেদবাণী ১ম খণ্ড, ৫২ নং )

LIBRARY
No.............

প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পর বাড়ী আসিয়া হাত-পা ধুইয়া তিনি তাঁহার বিছানায় গিয়া উপবেশন করিতেন। ঐসময় যদি কেহ উপদেশ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট যাইত, তাহা হইলে তাহাকে অতি বিনয়ের সহিত হয় তাঁহার বিছানায় বসিতে অনুরোধ করিতেন, নতুবা ঐ ঘরের মেঝে ( floor ) খুব পরিষ্কার থাকিলেও আগন্তুক ব্যক্তিকে কোনও প্রকার আসন দেওয়ার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিতেন।

অপরপক্ষে, যদি কেহ উপদেশ প্রার্থী হইয়া না আসিত, তবে কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোনও পুস্তক মনোযোগের সহিত পড়িতে থাকিতেন। একেবারে অলসভাবে বসিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার ঘর হইতে ফলাদি কিছু প্রসাদ না পাইয়া প্রায় কেহই বিদায় গ্রহণ করিতে পারিত না।

সময় সময় বিকালবেলা প্রায় ৩টার সময়ও তাঁহাকে বেড়াইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি। তিনি কখনও খুব আস্তে হাঁটিতেন না এবং বেড়াইতে বাহির হইয়া কোথায়ও বিশ্রাম করার কোনও প্রয়োজন বোধ করিতেন না। আমরা কোন কোন দিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তাঁহার পিছন হইতেই একস্থানে বসিয়া পড়িতাম এবং তিনি পার্কের মধ্যে খুব লম্বা চক্কর দিয়া পুনঃ আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে আবার তাঁহার অনুগমন করিতাম। বেড়াইবার সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি রাস্তার উপর যেখানে সেখানে থুতু ফেলিতেন না। প্রয়োজন হইলে রাস্তার

একধারে জঙ্গল বা ঝোপের মধ্যে ফেলিতেন, যাহাতে কোন পথিকের নগ্ন পদে চলার সময় বিরক্তির বা অসন্তোষের কারণ না হয়। বেড়াইবার সময় তিনি দ্রুত পদক্ষেপ করিতেন এবং কোন কথাবার্ত্তা বলিতেন না।

তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। যদি কোন পার্কে বেড়াইবার সময় কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইত, তাহা হইলে তৎপরদিন তিনি ঐদিকে বেড়াইতে না যাইয়া অপরকোন পার্কে বা স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তির সহিত পথে দেখা হইলে এবং তিনি প্রণাম করিলে, "কেমন আছেন," ইত্যাদি দুই-এক কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেন। ইহা হইতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ভ্রমণকালে বহুলোকের সঙ্গে নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তা বলায় মনের ধৈর্য্যেরই ব্যাঘাত হয় এবং কোন বিষয়েই উপকার না হইয়া অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকে। অতএব আমাদের দৈনন্দিন ভ্রমণের সময় অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যথাসাধ্য ভগবৎ চিন্তা, ধ্যান ও মনে মনে নাম জপে মগ্ন থাকাই উচিত। বেড়াইবার সময় কোথাও বসিয়া পড়িলে যদি পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘটে তাহা হইলে কেবল বৈষয়িক নানাপ্রকার আলোচনায় অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং মনের স্থিরতারও ব্যাঘাত হয়। অতএব ঐসম্পর্কে তাঁহার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে কখনও নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা বলিতে শুনি নাই। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে, তিনি ক্বচিৎ কথা বলিতেন।

শ্রীশঙ্কর সরকার

কিন্তু কেহ মনে মনেও তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলে, সংবাদপত্র বা অন্য পুস্তক পড়া বন্ধ করিয়া অনবরত উপদেশ দিতেন—ইহা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি। এমন কি, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও কোন উপদেশপ্রার্থীকে তাহার অভীপ্সিত উপদেশ হইতে বঞ্চিত করিতেন না। তদবস্থায়ও তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উপদেশ দিতেন, শায়িত অবস্থায় উপদেশ দিতে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। সময় সময় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, শারীরিক অত্যন্ত কাতর অবস্থায় তিনি বারংবার নিকটস্থ পাত্রে থুতু ফেলিতেছেন, তত্রাচ অনর্গল উপদেশ দানে বিরত হন নাই। দুঃখের বিষয় আমাদের ধৈর্যের এতই অভাব যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়াও শ্রোতাগণের মধ্যে কেহ কেহ একনিষ্ঠ ভাবে মনোযোগের সহিত ঐ অমূল্য উপদেশাবলী শ্রবন না করিয়া পরস্পর কথা বলিতেন। ইহাতে আমার মনে সময় সময় অত্যন্ত বিরক্তির সঞ্চার হইত। ঠাকুরকে কিন্তু কখনও শ্রোতাদের ঐ প্রকারের অনবধানতার জন্য কিছু বলিতে, বা কথা বন্ধ করিতে দেখি নাই। উপস্থিত সকলের মনোযোগ থাকুক আর নাই থাকুক তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি তাঁহার কথা অনবরত বলিয়াই যাইতেন। তাঁহার সমক্ষে কাহাকেও এই প্রকার অমার্জ্জনীয় আচরণের জন্য কিছু বলিতেও সাহস পাইতাম না। একদিন শ্রোতাদের মধ্যে এই প্রকার অমনোযোগিতা ও সৌজন্যের অভাব দেখিয়া স্বভাবতঃই আমার জন্মগত ক্রোধের ভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং শ্রোতাগণ ক্রমে ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিলে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলাম, "এইরূপ অসুস্থতার মধ্যে অতক্ষণ কথা বলিতে আপনার কষ্ট হয় না ?" ঠাকুর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন,

"না, কোন কষ্ট হয় না। কারণ এই ত' আমার কাজ।" এই প্রকার আচরণের দ্বারা, "ধৈর্য্যই ধর্ম্ম"—এই মহাবাণী, যাহার বিষয়ে তিনি মৌখিক উপদেশে ও পত্রাদিতে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনেক সময়েই বুঝাইয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ কাহাকেও কোন কথা বলিলে, সে যদি একাধিকবার বলা সত্ত্বেও বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিয়া নানা প্রকার মুখবিকৃতি আদির দ্বারা ঐ ভাব প্রকাশ করিয়া অতি ক্ষণস্থায়ী শান্তি বোধ করি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার, ঐ প্রকার কোন কোন ব্যক্তির প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া বারংবার সহাস্যবদনে তাহাদের কথা বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার উত্তর দিলে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য বারংবার প্রশ্ন করিলেও তাঁহার কথায় বা মুখের আকৃতিতে অসন্তুষ্ট হওয়ার চিহ্নের ছায়ামাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই।

যতদূর জানিতে পারিয়াছি, শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুকাল হইতেই কল্পনাতীতরূপে স্বল্পাহারী ছিলেন। তিনি নামমাত্রই আহার করিতেন। একদিন কোনও ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কিছু কিছু সুদ দিলেই মহাজন সন্তুষ্ট থাকে, অধিক প্রয়োজন হয় না।" বস্তুতপক্ষে বাল্যকাল হইতেই নেহাৎ পীড়াপীড়ি না করিলে, তিনি সহজে কিছুই খাইতে চাহিতেন না। তাঁহার অপরিসীম মাতৃভক্তি থাকা সত্ত্বেও এই আহারের ব্যাপারে সময় সময় মাতা-পুত্রে বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে একসময় বলিয়াছিলেন, "কখনও কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, শুধু খাওয়া লইয়াই মাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি।"

যৌবনকালে সাধারণতঃ জীবমাত্রেরই আহারের শক্তি ও লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সময়েও এমনই আহার করিতেন যাহা পাখীর আহার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুরের বয়স যখন ২৬।২৭ বৎসর, সেই সময়ের আহার সম্পর্কে কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার প্রণীত "আমার জীবন" নামক গ্রন্থের চতুর্থভাগে লিখিয়াছেন—"নিজে কিছুই আহার করে না, কদাচিৎ দুগ্ধ বা ফল আহার করে। অথচ তাহার সবল সুস্থ শরীর।"

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেও বলিতে পারি যে, তাঁহার আহারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইত না। সামান্য কিছু শাকসব্জী সিদ্ধ অথবা কোন সময়ে কলার সামান্য অংশ অতি সামান্য ঘিয়ের সঙ্গে চটকাইয়া আহার করিলেই যথেষ্ট হইত। সময় সময় শুধু ডাবের জল পান করিয়াও অনেকদিন কাটাইয়াছেন। ভক্তগণ ঐকান্তিক আগ্রহসহকারে নানাফল, মিষ্টি বা ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করিলে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য তিনি অতি সামান্য পরিমানে কিছু কিছু সময় সময় গ্রহণ করিতেন। আমার পরম সৌভাগ্য বশতঃ প্রায় পঁচিশ বৎসর—অনেক সময় তাঁহার সঙ্গ করা অবস্থায়, কখনও তাঁহার ক্ষুধাবোধ হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই নাই। ইহা হইতে আমার মনে হয় যে আমাদের সকলেরই আহার সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন যে, কোন বস্তুতে বা কোন সময়ে আহারে অনিচ্ছা হইলে তাহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। যিনি সকল বিষয়ে দেবদানব ও মানবাদি সকল জীবের আদর্শ স্থাপনের জন্য ভোগায়তন দেহ নিয়া অবতীর্ণ হইয়া-

ছিলেন, তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর আদেশও ঐ সম্পর্কে অতি বিনয়ের সহিত অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা নিষ্প্রয়োজনে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল রসাস্বাদনের অথবা আত্মীয়-স্বজনপ্রীতির প্রলোভনে পড়িয়া আহারাদিতে অসংযত হই বলিয়াই নানা রোগ দণ্ডের অবশ্যম্ভাবী শাসন ভোগ করিতে বাধ্য হই। উপরোক্ত আদর্শ স্মরণ রাখিলে অনেক প্রকারের রোগভোগের যন্ত্রণা হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। যে কোন রস আস্বাদের লোভে পড়িয়া অধিক আহার করিলে কয়মিনিট তাহাতে তৃপ্তিবোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আহার্য্যবস্তু জিহ্বার ডগার নীচে গেলে আর ত' কোন স্বাদ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু তদ্দরুণ পীড়া হইলে কত অধিক সময় নানা উদ্বেগ অশান্তি ও যন্ত্রনাবোধ হয় তাহা বারংবার চিন্তা করিলেই সম্ভবতঃ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ পরিমানে এই লোভের বেগ সংবরণ করা যায়। বিশেষতঃ এইরূপ ক্ষণিক রসাস্বাদ পরিনামে নানাপ্রকারের অভাব সৃষ্টি করিয়া অশেষ দুঃখেরই কারন্ হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভক্তগণকে কিংবা সকলের নিবৃত্তির জন্য কোন নির্দেশ বা উপদেশ দেন নাই। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী আহার-বিহারে কখনও বাধা দেন নাই বরঞ্চ ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের আহারাদিতে শান্তি পাওয়ার জন্য উৎসাহই দিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমার মনে হয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল প্রসূত যে কামনা-বাসনাদিতে আবৃত হইয়া আমরা এই ভোগায়তন দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি অর্থাৎ আমাদের ভবিতব্য বা অদৃষ্ট যে ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার ভোগান্ত না হইতে অবিচ্ছিন্ন বিমলানন্দ

উপভোগ করা অসম্ভব। সুতরাং স্থায়ী পরমানন্দ প্রার্থীর পক্ষে ধৈর্য্য ধরিয়া এবং ভগবৎ উন্মুখ হইয়া ঐ সকল ভোগান্ত করাই শ্রেয়। ভোগান্ত হওয়ার পূর্ব্বে পরমানন্দ উপভোগ করা অসম্ভব বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

এইস্থানে একটি দৃষ্টান্ত এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি শারদীয়া পূজার বন্ধ উপলক্ষে একবার শ্রীশ্রীঠাকুরসহ ১৩ দিন কোন বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমার ২।৩ দিন তথায় অবস্থানের পর ঠাকুর গৃহস্বামীর নিকট জানিতে চাহিলেন-- সেদিন কি কি রান্না হইয়াছে। তাঁহারা নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদির উল্লেখ করা সত্ত্বেও ঠাকুর বলিলেন, "মাংস রান্না হয় নাই, শুভবাবু খাইবেন কি?' বস্তুতঃপক্ষে ঐ সময়ে আমার মাংস খাওয়ার প্রতি একটু বেশী আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তথাকার দিদিদের চমৎকার রান্নার দরুণ আমি ঐ সময় মাংস খাওয়ার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। গৃহস্বামীরা এই কথা শুনিয়া প্রত্যহ খুব যত্নের সহিত আমাকে মাংস রান্না করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার শরীরের নানাস্থানে পাঁচড়ার ন্যায় ছোট ছোট গুটি উঠিতে লাগিল। অনবরত মাংস খাওয়াই ইহার কারণ মনে করিয়া আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ গুটিগুলি দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি মাংস খাওয়াইতে বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অনবরত মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করায় আমার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া তখনই কতকগুলি লতাপাতা নিঙড়াইয়া তাহার রস আমাকে পান করিতে দিলেন। ঐ রস পান করার পর আমার শরীরের গুটিগুলি সমস্তই

আস্তে আস্তে বসিয়া গেল। মাংস রান্নাও তথায় সাময়িকভাবে বন্ধ হইল। কেবল এই দৃষ্টান্ত কেন, সকল স্থানেই সঙ্গীয় ভক্তগণের যাহাতে আহারের ও থাকার সুব্যবস্থা হয় ঠাকুর তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং কোন বিষয়েই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। তাঁহার সঙ্গে রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে কোন্ কোন্ স্টেশনে উপাদেয় খাদ্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া দিতেন, কিন্তু স্বয়ং একবিন্দুও গ্রহণ করিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আহার্য্য গ্রহণ সম্পর্কে কোন বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু প্রত্যহ যথাসম্ভব ঠিকসময়ে আহার্য্য গ্রহণের নির্দ্দেশ দিতেন। প্রত্যহ ঠাকুর ঘরে পূজাদি সমাপনান্তে যেন দ্বিপ্রহর ১২ টার মধ্যে ভোগদান সম্পন্ন হয়, তাঁহাকে এই নির্দ্দেশ দিতে অনেক সময় শুনিয়াছি। এমন কি মহোৎসবাদিতেও যাহাতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়, ইহাই উপদেশ দিতেন। দ্বিপ্রহর ১২ টার পর ঠাকুরের ভোগ দিলে তাহা রাক্ষসের ভোগ হয় বলিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। আমরা যখন প্রাতঃকালে তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য উদগ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিতাম, তখনও কোনদিনই ১১ টার পর তাঁহাকে কোন কথা বলিতে শুনি নাই। পরন্তু ১১ টার পূর্ব্বেই আমাদিগকে বলিতেন যেন আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করি। তিনি স্বয়ংও যৎসামান্য যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহা ঠিক সময়েই নিবেদন করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোন উৎসবাদিতে উপস্থিত থাকিলে, সকলের প্রসাদ পাওয়ার পূর্ব্বে তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন

...র পরিকার

না। আমরা খুব তৃপ্তির সহিত সর্ব্ব ার আহার্য্য গ্রহণ করি ইহাই তিনি চাহিতেন এবং সময় সময় আম: আহার করার সময় তিনি স্বয়ং একটু দূর হইতে দেখিতেন। প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে অনেক সময় অনুভব করিয়াছি যে, অতিরিক্ত ভোজন বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনপ্রকার আহার্য্য গ্রহণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

এই সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে বর্ণনা করিতেছি। একবার ফেনী টাউনে মাষ্টার পাড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকালে একদিন মহোৎসব হইয়াছিল। আমি সংবাদ পাইয়া সপরিবারে নোয়াখালী সহর হইতে যাইয়া ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থান হইতেও ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া সমবেত হওয়ায় আমরা পরস্পর মিলনে এবং প্রসাদ গ্রহণে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। একসঙ্গে আপনজন অনেকে একস্থানে উপস্থিত হইলে ভোজনাদির সময় আমরা অনেকেই নিয়মানুবর্ত্তিতার বিষয় ভুলিয়া যাই। আমিও ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্ ঐদিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশী পরিমাণে খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শনান্তে বিদায় গ্রহণ করিতে অনুমতি চাহিলে ঠাকুর বলিলেন, "আমিও নোয়াখালী যাইব।" তৎপূর্ব্বে আমরা সকলেই জানিতাম যে, তিনি আরও কিছুদিন ফেনীতে থাকিয়া তৎপর অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাইবেন। ঐ কারণে আমার স্ত্রী সন্তানগণসহ আরও দু'একদিন ফেনী থাকিবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর নোয়াখালী যাইবেন বলায় আমার প্রাণে খুবই আনন্দ হইল বটে, কিন্তু উপস্থিত

ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আরও কিছুদিন তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া বিমলানন্দ অনুভব করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কোন কথা বলিলে তাহার পরিবর্ত্তন কখনও করেন না, ইহা ভক্তগণের অনেকেরই পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকায়, কেহই তাহাকে তথায় থাকার জন্য বা সেইদিন অন্য কোন স্থানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতেই গাত্রোত্থান করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার মোটরগাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া আমার পুত্র-কন্যাসহ অন্যান্য সঙ্গীগণকে রেলগাড়ীতে নোয়াখালী যাওয়ার জন্য বলিয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ঐ গাড়ীতে রওনা হইলাম। বদ্-হজমের দরুণ পথে চলিতে চলিতে আমি কিছুক্ষণ বেশ অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম এবং তৎপর চলন্ত গাড়ীতেই ভীষণ বমি করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

## অশ্বিনী বাবুর প্রতি কৃপা

গাড়ী রেললাইনের পূর্ব্বধারে আসিয়া কোন কারনে একটু থামিলে হঠাৎ বাঁশপাড়ার জমিদার, ঠাকুরের আশ্রিত আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী মহাশয় আসিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গদিতে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমার অফিসে তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন থাকায়, আমি তাহাতে সম্মত না হইয়া গাড়ী চালাইয়া দিতে বলিলাম। একটু দূরে অশ্বিনীবাবুদের গদির ঠিক সম্মুখে যাইয়াই গাড়ীর টিউব ও টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায় গাড়ী

অচল হইল। ভক্তবৎসল ঠাকুর ঐ টায়ার টিউব বদলানো সাপক্ষে অশ্বিনীবাবুর গদিতে গিয়া অনেকক্ষন বসিলেন।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে অশ্বিনীবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সেদিন গাড়ী থামাইতে আমি নিষেধ করায় তিনি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এইভাবে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ঐদিন বেশ কাতর অবস্থায়ই আমি নোয়াখালী শহরে আমার বাসায় ঠাকুরসহ উপস্থিত হইলাম এবং তাড়াতাড়ি আমাদের তৎকালীন ঠাকুরঘরে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া ভিতর বাটীতে আমার থাকার ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। তাঁহার অপার কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হইয়া অফিসে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার উপরোক্ত অসুস্থতা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়াকে কুক্কুর ভোজন বলে। অপ্রয়োজনে ও অনিচ্ছায়ও আহার করে, তাতেই এই প্রকার উপদ্রব ভোগ করিতে হয়।" আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রারব্ধের শক্তি এতই প্রবল যে, এই পরিণত বয়সেও ঐ প্রকার আহার গ্রহণের প্রলোভন শক্তির বেগ সম্পূর্ণরূপে সংবরণ করিতে পারি না।

ঐবার শ্রীশ্রীঠাকুর ২।১ দিন আমার বাসায় থাকার পর শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পরলোকগত পূর্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের অনুরোধে নদীর পাড়ে তাহাদের ভাড়াটিয়ার পরিত্যক্ত এক বাসায় থাকার জন্য যান।

তথায় এক ভদ্রমহিলা আমার সমক্ষেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে আহারের জন্য ঠাকুররের নিষেধ সত্ত্বেও অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "খাইতে খাইতে আমার পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর খাইতে মোটেই ইচ্ছা করে না।" তথাপি খাওয়াইতে জেদ করায় ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাবেই ঐ ভদ্রমহিলার আনীত মিষ্টি দ্রব্য গ্রহণ করেন। ইহার পরে ঠাকুর উদরাময়ে ভুগিতে থাকেন এবং যতদূর মনে পড়ে পরদিনই, "আমার বরইতলার আশ্রমই ভাল," বলিয়া আমার বাসায় চলিয়া আসেন এবং একটু সুস্থ হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমার ঐ বাসার ঠাকুর-ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড কুলগাছ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বাসায় আসিলে ঐ ঠাকুরঘরেই থাকিতেন। সেই জন্যই বোধহয় তিনি ঐ স্থানকে "বরইতলার আশ্রম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

আর একবার একটু অসুস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমার বাসায় আসিলে ভক্তগণ নানাবিষয়ে সুবিধা হইবে মনে করিয়া ঐ ঠাকুরঘর হইতে উঠানের অপর পার্শ্বস্থ ঘরে নিয়া তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় একদিন বা তুইদিন থাকিয়া তিনি নোয়াখালী শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপর আর কখনও দেহ নিয়া ঐ শহরে যান নাই।

## স্নান

শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি কখনও স্নান করিতে দেখি নাই। এবং কেহ স্নান করিতে দেখিয়াছে বলিয়াও এযাবৎ শুনি নাই। তত্রাচ, তাঁহার

LIBRARY
No.......[ ১৭ ]
Shri Shri ... Ashram

দেহ হইতে সুগন্ধই নির্গত হইত যদিও কয়েকদিন স্নান না করিলে সাধারণতঃ ব্যক্তি মাত্রেরই শরীর হইতে একটু দুর্গন্ধই বাহির হয়। কেন যে তিনি স্নান করিতেন না তাহা জানি না। আমাদিগকে কিন্তু তিনি আহারের পূর্ব্বে স্নান করিতে বলিতেন। এমন কি, সামান্য বাতগ্রস্থা কোন গুরুভগিনীকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পুকুরে নামিয়া অবগাহন স্নান করিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কোন্ সময় আমার স্নান করা উচিত এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দশটার সময়।" স্নান সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। এমতাবস্থায় স্ব স্ব প্রকৃতির উপরই এই বিষয়ে নির্ভর করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। শারীরিক শান্তির জন্য স্নানের প্রয়োজন কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য স্নানের কোনও আবশ্যকতা প্রতীয়মান হয়না। ঠাকুর একসময়ে তাঁহার কোন ভক্তের অনুসন্ধিৎসা নিবারণের জন্য বলিয়াছিলেন, "বাহ্যিক স্নানের প্রয়োজন হয়না, ভিতরেই স্নান হয়।"

একবার বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় থাকা কালে আমার কোন কোন বন্ধুকে প্রাতে শরীরে তেল মালিশ করাইয়া গঙ্গাস্নান করিতে দেখিয়া আমিও স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ব্রতী হইয়াছিলাম। তিন চার দিন ঐরূপ স্নানের পর আমার অত্যন্ত সর্দ্দি কাশি দেখা দিল এবং গলার আওয়াজও বসিয়া গিয়া বিকৃত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাকে আমার এই অবস্থা হওয়ার কথা বলায় ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সকলের গঙ্গা স্নান সহ্য হয়না।" তদবস্থায় ঐ স্নান না করাই

ভাল। এই কথা শুনিয়া আমি গঙ্গাস্নান বন্ধ করিয়া দিয়া রোগমুক্ত হইলাম।

অনেকেই সন্ধ্যাপূজা, এবং ধ্যান আদি করার পূর্ব্বে স্নান করিয়া একটু পবিত্র হইয়াছেন মনে করিয়া শান্তিবোধ করেন, ইহা স্বাভাবিক। তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই ঐ নিয়ম পালন করা সঙ্গত। কিন্তু স্নান না হইলে ঐ সকল কার্য্য করা যায়না, এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং ভগবৎ সেবার পরিপন্থী বলিয়াই মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বারংবার বলিয়াছেন যে, "নামের সঙ্গ বা নামের আশ্রয়ই জীবের মায়াময় সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র সম্বল।" যতবেশী আমরা নাম করিব বা নামে পড়িয়া থাকিব, ততই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। নাম করিতে শুচি নাই, অশুচি নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, সময় নাই, অসময় নাই, এমনকি হেলায় বা শ্রদ্ধায় যে কোন অবস্থায়ই নাম করা যায় তাহাতে নামের সুফল হইবেই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যেমন, জানিয়াই হোক কি অজানা অবস্থায়ই হোক্ অমৃত বা বিষ পান করিলে তাহার সুফল বা কুফল হইবেই। সেইরূপ নাম করার ফলও অবশ্যম্ভাবী, ইহা ঠাকুর স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। স্নান করিয়া পবিত্র হই নাই, সুতরাং এমতাবস্থায় নাম জপ কি সন্ধ্যাপূজাদি করা সঙ্গত হইবে না, এই ধারনা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ইহা দৃষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। শরীর অসুস্থ হইলে অনেক সময়ই স্নান করা নিষিদ্ধ হয়। তদবস্থায় নাম জপ ও ধ্যানাদিই রোগ আরোগ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক হয়। তখন ঐ সকল বাদ দেওয়া সঙ্গত হয় কি? বিশেষতঃ স্নান দ্বারা বহিরঙ্গ

LIBRARY
No.............

BANARAS
Ashram

ধৌত বা পরিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু শরীরস্থ কৃমি কীটাদি কি মলমুত্রাদি ত' থাকিয়াই যায়, সুতরাং স্নানের দ্বারা দেহ পবিত্র হইল কিরূপে? "নাম নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, অভিনাত্মা নামো নামিনঃ।" নামের সঙ্গ করিলে এবং একনিষ্ঠভাবে যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায় ভগবৎ উন্মুখ হইলে দেহ-মন সমস্তই পবিত্র হইয়া বিমলানন্দ অনুভব করা যায়, স্নানাদির কোনও প্রয়োজন হয় না। গতানুগতিক আচার-নিষ্ঠায় অধিক জোর দিয়া আমরা যেন আসল সত্য পথ ভ্রষ্ট না হই সে জন্যই হয়ত ঠাকুর স্নান না করার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও স্নানাদি করিতে নিষেধ করেন নাই। বরং ঐ বিষয়ে কেহ তাঁহার মত জানিতে চাহিলে তিনি স্নান করার সপক্ষে মত দিয়াছেন ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

## পরিধেয় বস্ত্র ও বেশভুষণাদি

পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের একই ভাব। তিনি কখনও গেরুয়া বসন বা মূল্যবান রেশমী বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না। অতি সাধারণ লোকের ন্যায় সাদা বস্ত্রই পরিধান করিতেন। ঐ বস্ত্র কেহ বদলাইয়া না দিলে কখনও তাহা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে শুনি নাই। যাঁহাকে কোন কোন ভক্ত লক্ষ টাকা দিয়া সেবা করিতে পারিলেও নিজকে পরম সৌভাগ্যবান ও কৃতার্থ বোধ করিত, সেই ঠাকুর একদিন ছিন্ন ময়লা বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় হঠাৎ আমার নোয়াখালী সহরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমার স্ত্রী বলিয়াছিলেন, "এবার তো খুব ভাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।" তাহাতে ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ! বেশ

হাওয়া খেলে।" যাঁহার কখনও প্রয়োজন বা অভাববোধ ছিলনা তিনি এই কথা ছাড়া আর কিই বা বলিবেন ?

কোনও কোনও সময় তিনি একই বস্ত্রে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। বহু কাল নিরুদ্দেশ থাকার পর তিনি যখন হঠাৎ দু' একদিনের জন্য তাঁহার জন্মস্থানের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার পরিধানে খুব মলিন বস্ত্রই দেখা যাইত এবং মাথার চুল ও দাড়ি-গোঁফাদি না কামানোই দেখা যাইত।

আনুমানিক ১৯০৭/'৮ ইং সন ( ১৩১৪ বাং ) হইতে যখন তিনি অনেক সময় লোকালয়েই থাকিতে লাগিলেন সেই সময় তাঁহার পরিধানে একখানা সাদা ধুতি ও শরীর সাদা চাদরে আবৃত থাকিতে দেখা যাইত। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার বহু বৎসর পর পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ জুতা পায়ে দিতে দেখেন নাই। অতি বৃদ্ধাবস্থায় ভক্তগণের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি কাপড়ের জুতা পরিয়া চলা-ফেরা করিতে অভ্যস্থ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া, হাত বুলাইবার সময় পদ-যুগলের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে ও মসৃণত্বে মুগ্ধ হইয়া আমি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, "অত বনে-জঙ্গলে বহু বৎসর খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, তথাপি পা দু'খানা অত সুন্দর মসৃণ রহিল কি প্রকারে ?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "কতবার যে পায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।" আমারও মনে হইল সেই কারণেই এবং আমাদিগকে অফুরন্ত আনন্দ প্রদানের জন্যই চরণ-যুগলের ঐ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ডিঙামাণিকে তাঁহার পৈতৃক বাড়ীর নিকটস্থ ঘটক বাড়ীতে আমরা প্রথমবার ডিঙামাণিক যাইয়া স্থান পাইয়াছিলাম। ঐ বাড়ীরই এককালীন বাসিন্দা শ্রীরাইমোহন ঘটক মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ১৩১৪ বাংলা সনে তিনি যখন প্রথম মৈমনসিংহ জেলায় ঠাকুরের দেখা পান, তখন ঠাকুরের গায়ে একখানা মোটা সাদা চাদর ও পরিধানে একখানা সাদা ধুতি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এমনকি, তখন তাঁহার গলায় তুলসীর মালাও ছিলনা। লোকালয়ে স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সকলের সঙ্গেই সাধারণভাবে চলাফেরার সুবিধার জন্য ক্রমশঃ গলায় তুলসীর মালা, গায়ে নিমা বা ফতুয়া ও পায়ে জুতা পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু বৎসর দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে ও ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এবং নানা তীর্থে আত্ম গোপন করিয়া তপশ্চর্যার পর যখন দেশে ফিরিলেন, তখন কেহই তাঁহার অঙ্গে কোন সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা কি ভস্মাদি এমনকি কপালে কি শরীরের কোন স্থানে চন্দনের ফোঁটা বা ছাপ বা কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচারাদি দেখিতে পান নাই। পূর্ব্ববৎ সাধারণ গ্রামবাসীর মতই সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দেহ-ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ঐভাবে চলা-ফিরার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে কখনও দেখি নাই। তত্রাচ কলিকাতার প্রসিদ্ধ সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী শ্রীশ্রীঠাকুরকে "শ্রীশ্রীনাম বিগ্রহ" ও "শ্রীশ্রীনাম সিদ্ধ" ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করিয়া ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবে এক বৎসর ব্যাপিয়া নানা স্থানে সভা-সমিতি করিয়া তাঁহার নাম ও উপদেশ প্রচারে যথেষ্ট প্রয়াস

পাইয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আচরণ ও উপদেশাবলীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

---

## শ্রীশ্রীঠাকুরের সকলের প্রতি সমভাব।

বেদবাণীর একখানা পত্রে দেখা যায়, ঠাকুর কোন ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন, "এ জগতে কেহই এক পাত্রে বসিয়া খাইতে শিখে নাই।" অর্থাৎ কেহই অপরকে নিজের ন্যায় সমজ্ঞানে ভালবাসিতে বা তদনুযায়ী অপরের প্রতি আচার ব্যবহার করিতে চাহে না। প্রত্যেকেই অপরের প্রতি পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যেই যে একই সত্তা বা প্রাণ বিরাজমান, তাহা মায়ামুগ্ধতা বশতঃ কেহই অনুধাবন করিতে পারে না। সুতরাং মায়াময় সংসারে মমতা ভ্রান্তি বশতঃ বিভিন্ন আবরণ বিশিষ্ট প্রাণীর প্রতি প্রত্যেকেরই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের আচার ব্যবহারে কখনও কোন দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বহু বৎসর যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত বা পরিচর্য্যাকারীর প্রতি তাঁহার যেরূপ ব্যবহার, একেবারে অপরিচিত ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বা ভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতি ও তাঁহার সেইরূপ ব্যবহারই ছিল। কাহারও প্রতি কোন আচার ব্যবহারের তারতম্য কখনও দৃষ্ট হইত না। তাঁহার উপদেশাবলী ও কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কিংবা যে কোন দেশের, যে কোন জাতীর লোকেরই তাঁহার কথাগুলি গ্রহণীয় ছিল বলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গেলে অতি মাধুর্য্যময় পবিত্র স্মৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিত। সর্ব্বশক্তিমান, নিরপেক্ষশক্তি শ্রীভগবানের ন্যায় সমভাব তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, একবার তাঁহার সন্নিধ্যে গেলে কেহই তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না।

শ্রীশ্রী ঠাকুর কোন ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"জগতে পরিচয়ের বিভিন্নতা কিছু নাই, কারণ আত্মা, যাকে প্রাণ বলে তিনি এক জানিবেন। দেহ সকল প্রকৃতি বিভিন্নতায় রূপ রূপান্তর হয়। প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হয় মাত্র জানিবেন।" ( বেদবাণী ৩য় খণ্ড, ৬৬ নং পত্র )। তাঁহার আচার ব্যবহার কি, অভ্যর্থনাদিতে উচ্চ, নীচ কি আপন-পরাদি, কোন পার্থক্যের ভাব কখনও দেখা যাইত না। তিনি সকলকেই সমভাবে আদর-অভ্যর্থনাদিতে আপ্যায়িত করিতেন। এমন কি, কুকুর বিড়ালাদি জীব জন্তুকেও তিনি কখনও ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিতেন না। জীব মাত্রকেই তিনি সমভাবে দেখিতেন এবং বৃক্ষ, তরু, লতাদির মধ্যেও প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্ব থাকা স্পৃষ্ট উপলব্ধি করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে।—একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমি বিহার প্রদেশান্তর্গত একস্থানে একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলাম। আমাদের থাকার ঘরের অনতিদূরে একটি কুমড়োর কি লাউ-এর সতেজ ডগা বেশ মাথা উত্তোলন করিয়া হেলিয়া দুলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "খুব ত' বাড়িয়া চলিয়াছ, একটু পরেই যে কাটিয়া ফেলিবে।"

মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, তরুলতা এমনকি তৃণগুচ্ছে-ও একই সত্তার অস্তিত্ব যাহাতে আমরা উপলব্ধি করি, সেই দৃষ্টান্তই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা মায়ামুগ্ধতা বশতঃ কর্তৃত্বাভিমান ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের আওতায় পড়িয়া অন্য জীব ত' দূরের কথা—মানুষের মধ্যেও কতই না পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া কেবল নিজেদের কষ্ট-ভোগের পথই প্রস্তুত করিয়া দুঃখ ও অনুশোচনা ভোগ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান সকলই সহ্য করিতে পারেন বলিয়া এবং কাহাকেও কোনরূপ উপেক্ষা করেন না, বিরক্তও হন না বলিয়া লোকে ভগবান বলে। তাঁহার ভক্তও তাঁহার কাছ হইতে শক্তি আহরণ এইভাবেই করে। পঙ্কে গেলে ভূত ও দ্বন্দন মায়ার বিপর্য্যয় তরঙ্গে পড়িয়া লাঞ্ছনা পাইয়া, ভাগ্যক্রমে সুখ দুঃখাদি শুভ অশুভ ভোগ করে। ভগবৎ প্রাপ্ত হয় না।" (বেদবাণী প্রথম খণ্ড ১০২ নং)। তাঁহার দৈনন্দিন আচরণে ও কার্য্যে আমরা উপরোক্ত ভাবের অভিব্যক্তি সকল সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের ন্যায় তাঁহার দাসানুদাসের এমনকি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও তিনি "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা ও আচরণে বিনয়ের অবর্ণনীয়, অতি স্নিগ্ধ, মধুর ভাব সকল সময় ফুটিয়া উঠিত। বাংলা ভাষার "তুই" শব্দটি তাঁহার মুখ হইতে কখনও বাহির হইত না। কাহাকেও এমনকি অতি অল্প বয়স্ক শিশুদেরও "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতে তাঁহাকে শুনি নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী না হইলে, এইরূপ ভাবের উন্মেষ ও আচার ব্যবহার, সকল সময় সকলের প্রতি হওয়া স্বাভাবিক ও সম্ভব কিনা পাঠক পাঠিকাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত নিরপেক্ষ শক্তি। সকল সময় সকল অবস্থায় তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীর ছিলেন। কখনও কোন বিষয়ে চঞ্চল হইতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সকল সময়ই তিনি ঐ জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র চৌমুহনীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই ভীষণ সঙ্কট

সময়ে তথা হইতে তাঁহার নিজের অন্যত্র যাওয়া দূরে থাকুক, কেহ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি বা উপদেশ চাহিলেও তিনি বলিতেন, "যেখানেই যান, কপাল ত' সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে। জননী, জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন ?" এই সম্পর্কে তাঁহার কোন ভক্তের পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। জননী, জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভয়, শোকে (কাতর) হইয়া পালাবার স্থান একমাত্র সত্য বই আর নাই। সকল লোকেই মরভূমের অধীন। সত্যই মরভূমের অতীত জানিবেন। অতএব সত্য আশ্রয় করিয়া থাকিতে চেষ্টা করাই জীবের স্বধর্ম্ম।" (বেদবাণী ২য় খণ্ড, ২০৭ নং পত্র)। শ্রীশ্রীঠাকুর "সত্যই ভগবান" বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত উপদেশ ও তাঁহার সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে চৌমুহনীতে উপস্থিতি ইত্যাদি কারণেই তথাকার বন্দরের ধনী, মহাজনদের একজনও ঐ দাঙ্গার ভীষণ অবস্থায়ও জীবন নাশের ও ধন সম্পত্তি লুঠতরাজের ভয়ে স্বস্থান ত্যাগ করেন নাই। সেই সময়ে ঐ জেলার বহু সহস্র লোক তাঁহাদের সমক্ষেই চৌমুহনী রেল ষ্টেশন দিয়া প্রাণভয়ে তাহাদের বহুকালের সঞ্চিত ধন, সম্পত্তি ও পূর্ব্বপুরুষদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ভাবে নানা দিকে পালাইতেছিল। ইহাদের অনেকেই কল্পনাতীত দুঃখ ও দৈন্যে পতিত হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্তও কেহ কেহ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। পক্ষান্তরে চৌমুহনীতে অবস্থানকারী ব্যবসায়ীগণ অনেকটা শান্তিতেই ঐ সময় কাটাইয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্তও কাটাইতেছেন।

নোয়াখালী জিলায়, লুণ্ঠনকারীদের জন্য চৌমুহনী অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় স্থান আর ছিল না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় সেখানে কোন দাঙ্গা, হাঙ্গামা বা লুঠতরাজ হয় নাই। একদিন কিন্তু তথায়ও ভীষণ বিপর্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় যে ট্রেন চাঁদপুর হইতে আসিয়া চৌমুহনী পৌঁছিত, তাহাতে কোন ব্যাঙ্কের একজন বৃদ্ধ শিখ দারোয়ান ও একজন গুর্খা আসিয়াছিল। ঐ দুইজনের উপস্থিতির সংবাদ লোকপরম্পরায় প্রচারিত হওয়া মাত্র চারিদিক হইতে অশিক্ষিত বহু মুসলমান হৈ চৈ করিয়া একত্রিত হইয়া তথাকথিত হিন্দু গুণ্ডাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ষ্টেশনের নিকটস্থ যে বাঙ্গলোতে শ্রীশ্রীঠাকুর সে সময় থাকিতেন। তাহার কম্পাউণ্ডেও প্রবেশ করে। একজন অপরিচিত লোককে তাঁহার থাকার ঘরে দেখিয়া উহারা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ষ্টেশনের দিকে নিয়া যায়। সে ছিল পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া, অতি নিরীহ, ক্ষীণজীবী, ঠাকুরগত প্রাণ শ্রীমান ইন্দ্রকুমার দাস। এই আকস্মিক বিপৎপাতে সে একেবারে হতবুদ্ধি, নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন,— "সে তো কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে নেন কেন?"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি বিছানা হইতে নামিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় ঘরের দরজা পর্য্যন্ত তাহাদের পিছন পিছন আসিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার ভিতরের লুক্কায়িত অসীম যোগ, বিভূতির বিন্দু-মাত্রও প্রকাশ করিলে তাহারা শ্রীমান ইন্দ্রকে এক ইঞ্চিও নাড়াইতে পারিত না। উহারা ঐ কম্পাউণ্ডের বাহির হওয়ার একটু পরেই

শ্রীমান উপেন্দ্র কুমার সাহার সম্মুখে পড়িল। উপেন অনেক অনুনয়, বিনয় করিয়া এবং পরিশেষে তাহাদের সঙ্গে টানাটানি করিয়াও ইন্দ্রকে ছাড়াইয়া আনিতে না পারিয়া অতি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর অবিলম্বে শ্রীমান ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া আনার জন্য শ্রীমান উপেনকে নির্দ্দেশ দিলেন। ঐ সময় উত্তেজিত জনতার মধ্যে যাইয়া কাহাকেও ছাড়াইয়া আনার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইলেও, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদে সে তখনই ষ্টেশনে যাইয়া শ্রীমান ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও কোন তর্ক, বিতর্ক বাক্ বিতণ্ডার মধ্যে ছিলেন না। নানা স্থানে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের গৌরব ও অহঙ্কার যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা অসীমের বিদ্যা ও জ্ঞানের ওজন করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সুতরাং তাঁহার সান্নিধ্যে কোন তর্ক বিতর্কের অবকাশই ছিল না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম শক্তি ও জ্ঞান সকল সময়েই লোকসমক্ষে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিজে অতি সাধারণ একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন এবং নিজ হইতে কাহারও সহিত শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তত্রাচ, বহু শাস্ত্রবিদ্ মহা পণ্ডিতগণ তাঁহার

অধ্যাত্মবিদ্যা ও জ্ঞানের অসীমত্ব উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার ভূতপূর্ব্ব সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি, প্রথমতঃ ঠাকুরের শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম জ্ঞানাদি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। দুই, তিন দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শাস্ত্রাদি আলোচনার পর তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি, প্রণীত 'রাম ঠাকুরের কথা' নামক গ্রন্থের নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

"প্রভাতবাবু অসিয়াই গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে আরও পূর্ব্বে কেন সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সে জন্য আমাকেও বরদাবাবুকে খুব একচোট গালাগালি করিলেন। পরে ঠাকুরের সঙ্গে সামান্য দু, একটি কথা বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ দুখানি দুইহাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া গীতার একাদশ অধ্যায় আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া গেলেন। ঠাকুর স্থির, নিস্পলক, নিস্পন্দ, মনে হইল তিনি যেন এ জগতে নাই। ঠাকুরের তখনকার সেই মূর্ত্তি আমি বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না, পরে কখনও কখনও মনে হইয়াছে যে, তিনি যেন গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের সেই ভয়াবহ বিশ্বরূপ নিজ মাধুর্য্যে আবরণ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। আবৃত্তি শেষ হইয়া গেলে প্রভাতবাবু ঠাকুরের চরণযুগল ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন

এবং গলদশ্রু লোচনে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ঠাকুরকে একবার তাঁহার বাড়ীতে পদধুলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন।"

প্রভাতবাবুর রচিত নিম্নলিখিত 'শ্রীরাম স্তোত্রম্' হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, তাহা লেখার সময়ে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান সমগ্র বিভূতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বোধ হইয়াছিল,

"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় ॥

শ্রীশ্রীরাম—স্তোত্রম্।

নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় নিত্যানন্দ স্বরূপিণে।
কলিকল্মষনাশায় প্রেমামৃত প্রবর্ষিণে ॥ ১ ॥
শান্তায় শান্তিরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
দয়া প্রবণ চিত্তায় স্থির প্রজ্ঞায় বৈ নমঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত সমস্ত কামায় জিতদ্বন্দ্বায় ধীমতে।
নিত্যমুক্তায় শুদ্ধায় ক্ষুত্তৃষ্ণা রহিতায় চ ॥ ৩ ॥
গুরবে জ্ঞানরূপায় সূক্ষ্মায় স্থূলরূপিণে।
বিন্দুভূতায় নিত্যায় চিদাকাশ স্থিতায় চ ॥ ৫ ॥
অসুরাণাং বধার্থায় পুরা ত্রেতাযুগে ভুবি।
জাতো নারায়ণঃ সাক্ষাল্লক্ষ্মণশ্চানুজো হ ভবৎ ॥ ৬ ॥
সোহয়ং রঘুত্তমো রামো রামচন্দ্রেতি সংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুরাসীৎ কুলে পুণ্যে কমলা-মধু যোগতঃ ॥ ৭ ॥
দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধা দ্বাপর সংযুগে।
চক্রীড় গোপবালৈশ্চ রেমে বৈ গোপীভিঃ সহ ॥ ৮ ॥

সোহয়ং লীলায়তে নিত্যং গোবিন্দো ভগবান হরিঃ।
নরেষু নররূপেন হ্যাত্মারামো রিরংসয়া ॥ ৯ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাণাং বীক্ষ্য দুর্গতিং।
গৌরচন্দ্রোহবতীর্য্যাথ শচীগর্ভমহার্ণবে ॥ ১০ ॥
গুহ্যং রাসরসং দিব্যং প্রতেনে প্রেমবিহ্বলঃ।
সোহয়ং বিচরতী দানীং জ্ঞানানাং ক্লেশমুদ্বহম্ ॥ ১১ ॥
ভ্রাতৃরূপেণ কেষাং চিদ্বন্ধুভাবেন চ ক্বচিৎ।
পালয়ন্ স্বগণং দুঃখাৎ সদাপ্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥
যবনোহপি হি যৎ সঙ্গাল্লেভে বৈ পরমং পদম্।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥ ১৩ ॥
যৎ কৃপালেশমাসাদ্য কিচনো মুক্ততাং গতঃ।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥ ১৪ ॥
অন্যেষাং ব্যাধিমাশ্রিত্য যো ভুঙক্তে কৃপয়া মুদা।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥ ১৫ ॥
উপদেশং বিতনুতে 'চিত্তস্থৈর্য্যাবধারণম্'।
সন্ততং লোকশিক্ষায়ৈ মথিত্বা শাস্ত্র-সাগরম্ ॥ ১৬ ॥
'প্রাণ এব পরোধর্ম্মো গুরুরেবাশ্রয়ঃ পরঃ'।
'তদ্বৈব লভতে শান্তিং নিরপেক্ষো ভবেদ্ যদা ॥ ১৭ ॥
গিরা মধুরয়া চৈবং দেশ্যং দিশতি যঃ সদা।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥ ১৮ ॥
ধৈয়স্ত রামঃ প্রবিশুদ্ধমূর্ত্তি জপ্যং সদাস্যে বিমলং হি নাম।
সেব্যং সদা তচ্চরণারবিন্দং পেয়ং মুহুস্তৎ করুণামৃতং হি ॥ ১৯ ॥

কিং বর্ণ্যতে তব গুরো সুবিচিত্রলীলা দেব! প্রমুগ্ধ
মতিনাহ্যময়াধমেন ?
ক্ব ত্বং নরামরমতের বিচিন্তনীয়ঃ ক্বায়ং সুতুস্তর ভবাম্বুধিমগ্নচিত্তঃ
॥ ২০ ॥

উক্ত প্রভাতবাবু লিখিত 'তাঁহার কথা' নামীয় প্রবন্ধের শেষভাবে ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রাণের আবেগে শেষে বলিতে ইচ্ছা হয়—'তুঁয়া চরণে মন লাগহুঁ রে'। জন্মে জন্মে যেন তাঁহার শ্রীচরণের দাসানুদাস হইতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব আশুতোষ অধ্যাপক—বেদবাণী সঙ্কলনকারী ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম দুইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া ভুল ধারণা লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তৃতীয়দিন দর্শন লাভের পর, তিনি তাঁহার প্রণীত "রাম ঠাকুরের কথা"য় লিখিয়াছেন—"আমার বিদ্যাভিমান আমার সমস্যা, আমার বিচার বিতর্ক সবই যেন স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। আমি ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলাম। প্রীতির বন্ধনে তিনি আমাকে আটকাইয়া ফেলিলেন।"

বেনারস গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ, ডি. লিট. মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীধামে কখনও কখনও গেলে, তাঁহার অলৌকিক উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও জ্ঞান গরিমায় স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার প্রণীত 'সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

"কাশীধামে ( ঠাকুরের সঙ্গে ) তাঁহার প্রথম দর্শন ঘটে ময়মনসিংহ সুসঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রেরণায়। তিনি শতমুখে শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের প্রশংসা করিতেছিলেন। ............আমরা তিন চার জন তখনই আগ্রহাকুল প্রাণে ঠাকুর দর্শনেচ্ছায় চিন্তামনিগনেশে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম একটি আনুমানিক ৬০/৬৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মহাত্মার গলায় তুলসীর মালা, অঙ্গে একখানা তাঁতের শুভ্র বর্ণের চাদর, মুখে বিনয়পূর্ণ মধুর হাস্য, ধীর, স্থির সৌম্যভাবে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র আমরা অপরিচিত হইলেও আমাদিগকে নম্রভাবে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক সাদর আহ্বান করিলেন। আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর যাহা বুঝিলাম, তাহাতে আমাদের ধারণা হইল যে, তিনি বস্তুতঃই একজন মহাপুরুষ।.........আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল গভীর জ্ঞানের কথা তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইত তাহার তুলনা নাই। সরলতা, অমায়িকতা, মাধুর্য্য ও নম্রতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। তিনি সর্ব্বভূতে সত্যই ভগবৎ দর্শন করিতেন। তাই কোন লোক তাঁহার নিকট আসিবামাত্র তিনি নিজেই তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেন। আগন্তুক প্রণাম করিবার অবসর পাওয়ার পূর্ব্বেই ঠাকুর মহাশয় তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিতেন।"

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুদিন পর বিক্রমপুর ফিরিয়া আসিলে, তথাকার বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই

তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিয়া বিস্ময়ভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একেবারে প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তি কি প্রকারে ঐরূপ অগাধ পাণ্ডিত্যের শক্তি বনে, জঙ্গলে ঘুরিয়া অর্জ্জন করিলেন, ইহাই তাঁহাদের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যাহা হউক, এই বিষয়ে আর অগ্রসর না হইয়া ঠাকুর প্রথমবার যখন তাঁহার শ্রীগুরুদেব ও গুরুভ্রাতাগণসহ হিমালয়ের গিরি কন্দরে ও অন্য নানা তীর্থস্থানে বহু সাধু মহাত্মা দর্শন করিয়া আনুমানিক ২৪/২৫ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়াছিলেন, তখন কি শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।

আনুমানিক ১২ বৎসর বয়সে প্রথমবার ঠাকুর ভগবৎ উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপর কামাক্ষ্যায় শ্রীগুরুর দর্শনলাভ করিয়া তিনি তাঁহারই সঙ্গে হিমালয় পর্ব্বতের বহু অগম্য স্থানে সাধুদর্শন ও নানাস্থানে তীর্থ পর্য্যটনাদি করিয়া প্রায় ১২ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অসীম অধ্যাত্মজ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জন করা সত্ত্বেও প্রথমতঃ পাচকের কাজ ও তৎপর এক ওভারসীয়ারের সরকারের কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার আচরণের কিঞ্চিৎ আভাস স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত "আমার জীবন" গ্রন্থে পাওয়া যায়। কবিবর ঐ সময়ে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ফেনী মহকুমার হাকিম ( S. D. O. ) ছিলেন। ঐ গ্রন্থের চতুর্থভাগে তিনি "প্রচারক না প্রবঞ্চক" শীর্ষক অধ্যায়ে বহু সাধু সন্ন্যাসীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক

ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"রাম ঠাকুরের বাড়ী বিক্রমপুর, বয়স ২৬/২৭ বৎসর মাত্র।...... দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্ত মূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। কোন কথা কহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার আট হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য বাংলা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এমনকি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম এবং পতি, পত্নী মুগ্ধচিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা সকল শুনিতাম। বলা বাহুল্য, সে পেশাদারী হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে।"

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে 'বিদ্যা' বলি, সেই পুঁথিগত বিদ্যা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছিল না বলিলে-ও অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিলে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, আমাদের ধারণার বহির্ভূত কোন কারণে এই প্রকার অসীম পাণ্ডিত্য তাঁহার ভিতর হইতে প্রকাশ হইয়া মহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও অভিভূত করিত।

এই সম্পর্কে তাঁহার একটি কথা এখানে প্রকাশ করতে ইচ্ছা হইতেছে। অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন সেইদিন দীক্ষা ও তৎপর কিছুক্ষণ উপদেশ দানের পর আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া

যাওয়ার সময় তিনি নিজ হইতেই বলিয়া গেলেন—"পড়াশুনা করার কিছু দরকার হয় না, আপনা হইতেই সব হয়।" আমি ঐ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা না করায় এবং তৎকালে ঐ সম্বন্ধে আমার মনে কিছু না আসা সত্ত্বেও ঠাকুর নিজ হইতে হঠাৎ এই কথা বলায় আমার মনে হইল যে, নানাজাতির ও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার যে একটা আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতে লুক্কায়িত ভাবে আমার মনে স্থান পাইয়াছিল, সেদিকে যেন আর অগ্রসর না হই, তজ্জন্যই ঠাকুর স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আমাকে ঐ উপদেশ দিয়া গেলেন। হয়ত ঐ উপদেশ না পাইলে, আমার অতি সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্ভূত চিন্তার তরঙ্গে পড়িয়া নানা গ্রন্থে, নানা মুনির নানা মতে বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত সত্য ও কাম্য বস্তু হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতাম। ঠাকুর সময় সময় বলিতেন—"এক সাধে সব পায়, বহু সাধে সব যায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ দেওয়ার কালে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত, স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর স্বরপ্রবাহ যেন একভাবেই চলিতেছে—তাহাতে কোন উত্থান পতন নাই; সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যেন ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। চিন্তা ভাবনার, কি, বুদ্ধি বিবেচনার তাহাতে কোন স্থান বা অবকাশ ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রলেখাও ঠিক ঐ ভাবের ছিল। তিনি পোষ্টকার্ড কিংবা চিঠির কাগজ হাতে লইয়া পেন্সিল বা কালি, কলমের সাহায্যে একধারায় লিখিয়া যাইতেন। লেখা শেষ হইলে ফিরিয়া পড়িতে কখন-ও দেখি নাই। চিঠি লেখার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মন কিংবা বুদ্ধির কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত না।

উমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীঠাকুর অসীম পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কথাবার্ত্তা কি আচরণে তাঁহার যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে দিতেন না। তিনি যেন আমাদের মতই একজন এমন ভাবে এবং নেহাৎ অন্তরঙ্গের মতই আলাপ ব্যবহার করিতেন। তিনি সর্ব্ববিষয়েই অতি উচ্চ স্থানে অধিরূঢ় এবং আমরা নেহাত কৃপার পাত্র জানিয়াও কখনও কাহাকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা দূরের কথা— সকলেই সমভাবে আদর আপ্যায়ন করিতেন। সকলকেই শান্তিতে ও আনন্দে রাখিতে তিনি নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার আচরণে পুর্ব্বাপর ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাধারণতঃ মানুষের চক্ষে যাহারা অতি নিকৃষ্ট চরিত্রের বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহারাও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কাহাকেও রূঢ় বাক্য বা আচরণে তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা বা চরিত্র সংশোধনের জন্য সচেতন করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি মানসিক সকল প্রকারের রোগে একই মহৌষধ— "নাম" সেবন করিতে বলিতেন এবং হাতুড়ে বৈদ্যের ন্যায় মূল রোগ ধরিতে না পারিয়া নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগে রোগীর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কত আপনভাবে তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে চলাফেরা করিতেন, এবং তাহাদের বিন্দু মাত্রও কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; তাহা ইন্দুবাবুর প্রণীত "রাম ঠাকুরের কথা নামক গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলে কতকটা পরিস্ফুট হইবে। একদিন ইন্দুবাবু আরও কয়েকজন ভক্তসহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে

লইয়া কলিকাতা হইতে ট্রেনে আমতা যাইতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ইন্দুবাবু লিখিয়াছেন—"গাড়ী চলিতে লাগিল এবং আমি ও মতিবাবু প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই প্ল্যাটফর্ম্মে নামিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিকাংশ ষ্টেশনেই গাড়ী দু, এক মিনিটের বেশী না থামায়, আরাম করিয়া সিগারেট খাওয়া হইল না। দু চারটি টান দেই, আবার নিভাইয়া ফেলি, এইরূপ চলিতে লাগিল। হঠাৎ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বার বার উঠা নামা করার দরকার কি, ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া গাড়ীতেই সিগারেট খান।" আমরা উভয়েই অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম, এবং ঠাকুর আরও দু, একবার বলা সত্ত্বেও দাদার বাসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর সিগারেট খাইলাম না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজহাতে যে কাজ করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে করার কোন সুযোগ দিতেন না। সঙ্গীয় ভক্তকে কোন আদেশ দেওয়া ত' দূরের কথা, বরং তাহাদের নিজস্ব কষ্টসাধ্য কাজে সহায়তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। এইরূপ দৃষ্টান্তের কোন ইয়ত্তা নাই। এই সম্পর্কে একটি অতি চমকপ্রদ সত্য ঘটনা ইন্দুবাবু প্রণীত রাম ঠাকুরের কথা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের প্রথম অবস্থায় পঞ্চুবাবুকে (জনৈক ভক্ত) কিছুদিন ঠাকুরের তল্পীবাহকরূপে দেখিয়াছিলাম। ঠাকুর যেখানেই যাইতেন পঞ্চুবাবুও পিছনে পিছনে ঠাকুরের গাঁটরী লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি, বৃন্দাবনে দুরন্ত গরম। নৈনিতালের ঠাণ্ডা আবহাওয়া হইতে আসিয়া পঞ্চুবাবুর পক্ষে এই গরম অসহনীয়

হইয়া উঠিল। ঠাকুর কিন্তু যেমন তেমনই আছেন, নৈনিতালেও যা, আর বৈশাখ মাসের বৃন্দাবনেও তা, এক তলায় একখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, সঙ্গেই একটি ছোট রান্নাঘর ছিল। রান্নাঘরের পাশেই একটি কুয়া, জল তুলিবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। পঞ্চুবাবু বলিলেন যে, ভোরবেলা শৌচাদি সমাপন হইয়া গেলেই ঠাকুর তাঁহাকে যমুনায় স্নান করিতে পাঠাইয়া দিতেন। পঞ্চুবাবুরও ইহাতে আপত্তি করিবার উপায় ছিল না, কারণ একটু বেলা হইলেই বালু এমন তাতিয়া যাইত যে ঘরের বাহির হওয়া সম্ভব হইত না, মনে হইত যেন আগুনের হলকা বহিয়া যাইতেছে। যমুনা হইতে ফিরিয়া পঞ্চুবাবু দেখিতেন যে ঠাকুর ইতিমধ্যে উনান ধরাইয়া তরকারী রাঁধিয়াছেন, শাক ভাজিয়াছেন, এবং হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দিয়াছেন। চালের সঙ্গে কিছু ডালও পুঁটুলি বাঁধিয়া হাঁড়িতে ফেলিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহই হইত, ঠাকুর পঞ্চুবাবুর কোন আপত্তি আমলেই আনিতেন না। পাছে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় এই জন্যই ঠাকুর তাঁহার নিজের আহারটি অত্যন্ত সরল করিয়া লইয়াছিলেন, ৪টি খেজুর ৪টি মনক্কা ও তিন চার গ্লাস জল খাইয়াই কাটাইয়া দিতেন। গরমের দরুন ৮টা, ৮-৩০ মিনিটের ভিতরেই স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হইত, রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বাহিরে যাওয়া সম্ভব হইত না। পঞ্চুবাবু কখন বা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলিয়া সময়টা কাটাইয়া দিতেন। ঘুম বড় একটা হইত না, মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসিত। কিন্তু যখনই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত তখনই দেখিতেন যে

ঠাকুর পাখা লইয়া তাহাকে হাওয়া করিতেছেন, অথবা ভিজা গামছা দিয়া সযত্নে তাহার গা মুছাইয়া দিতেছেন। পঞ্চুবাবু উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, ঠাকুরের এই সেবাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না, অথচ ঠাকুরকে ফেলিয়া চলিয়াও যাইতে পারেন না, নিতান্ত অস্বস্তিতে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। পঞ্চুবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেন। ঠাকুরকে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী অনেক সুকৃতি বলেই তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে কিছুই হইল না। একদিন কিন্তু ঠাকুরের আচরণ পঞ্চুবাবুর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। যে ভৃত্যটিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল সে সকালে তিন বালতি ও সন্ধ্যার পর তিন বালতি জল তুলিয়া দিয়া যাইত। ইহাতেই সব কাজ সমাধা করিতে হইত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীওয়ালার পুত্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল যে ভৃত্যটি অসুস্থ, সে আসিতে পারিবে না, সুতরাং জল তোলার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিয়া লইতে হইবে। রাত্রিতে রান্নার হাঙ্গামা ছিল না, বাজার হইতে পুরী, তরকারী ও কিছু মিষ্টি আনিয়াই পঞ্চুবাবু চালাইয়া দিতেন। অনুসন্ধানে দেখিলেন যে, তখনও কলসীতে ও একটা বালতিতে যে পরিমান জল আছে তাহাতে রাত্রিটা অনায়াসেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে সুতরাং স্থির করিলেন যে রাত্রে আর জল তুলিবেন না, প্রাতঃকালে ভৃত্য আসে ভাল, নতুবা নিজেই যাহা হয় করিবেন। ঠাকুরকেও এই কথা জানাইলেন। ইহার খানিক পরে পঞ্চুবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং যমুনার তীরে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া, রাত্রির খাবার কিনিয়া ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। একটু পরেই হঠাৎ তাহার বালতিগুলির

দিকে নজর পড়িল, তিনি দেখিলেন যে, তিনটি বালতিই জলে ভর্ত্তি হইয়া আছে, কর্ম্মটি যে ঠাকুরের তাহা বুঝিতে পঞ্চুবাবুর কোন কষ্টই হইল না। ঠাকুরের দিকে তাকাইতেই তিনি যেন কাঁচুমাচু হইয়া গেলেন। পঞ্চুবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে কোন বালক দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধরা পড়িয়া গেলে শাস্তির ভয়ে যে ভাবে তাকাইয়া থাকে ঠাকুরও যেন ঠিক সেইভাবেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু পঞ্চুবাবুর তখন মাথা গরম, এই মধুর ভাবটি তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না। ঠাকুরকে বলিলেন ; এই জল কোন কাজে লাগবে, আমার শ্রাদ্ধে, না আপনার শ্রাদ্ধে ?" এই বলিয়া বালতির জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নিজে জল তুলিয়া রাখিলেন। পরের দিনই ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন এবং হাওড়া পৌঁছিয়া আমার বাসায় আসিয়া উঠিলেন।

রাত্রে খাইতে বসিয়া পঞ্চুবাবু আমাকে এই ঘটনাটি জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তিনি ঠাকুরের হাতের রান্না খাইতে কিছুতেই সম্মত হ'ন নাই কিন্তু ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে তিনি স্নান সারিয়া আসিয়া রান্না করিতে বসিলে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে উহা সমাধা করিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। ঠাকুর নিজে তো বসিয়াই থাকেন, সুতরাং রান্নার কাজটা তিনি যদি খানিকটা আগাইয়া রাখেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুব্যবস্থা হয়। পঞ্চুবাবু মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন সে শীঘ্রই পাচক নিযুক্ত করিবেন। কোনও ফল হইবেনা বুঝিয়া প্রকাশ্যে আর বিশেষ কোন প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু জল তোলাটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন

না। বৈশাখ মাসের শেষে বৃন্দাবনের কূয়া হইতে জল তোলা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে সহজে বুঝিবেন না। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও ঠাকুরের নিজের হাতের তোলা জলে হাত পা ধোয়া, বা শৌচাদি কর্ম্ম করার কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। এইজন্যই পঞ্চুবাবু ঠাকুরকে লইয়া আর বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না।"

এই প্রকার সকলের সঙ্গে পরমাত্মীয়তা ও সমভাবের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইব। সেই ঘটনা বহু সাধকের জীবনী লেখক বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীশঙ্করনাথ রায়ের "ভারতের সাধক" গ্রন্থে "রামঠাকুর" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "রামঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া এক ভক্তের মেসে উঠিয়াছেন। কয়েকটা দিন একটু নিভৃতে কাটাইতে চান, তাই তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রচার করা হয় নাই। এসময়ে হঠাৎ একদিন এক যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের এক পুরাতন ভক্ত সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবেই সে আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠাকুরের এই ভক্তটি কিছু সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া যান। এখন কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় অথবা দায়িত্বশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে দাঁড়াইয়া এফিডেভিট করিতে হইবে এবং এই এফিডেভিট এবং সানাক্তকরণ কাজ শেষ হইলে তবে ঐ টাকা উঠানো যাইবে। আগন্তুক ছেলেটির মতে ঠাকুরই এই কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। কারণ মৃত ব্যক্তির সহিত তিনি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত, বহু লোকের তিনি সম্মনীয়ও বটেন্। তাই তাঁহাকেই সে অনুরোধ

জানাইতে আসিয়াছে। ছেলেটি অল্প বয়স্ক, তরলমতি। ঠাকুরের মত দিকপাল মহাপুরুষকে এই ধরণের বৈষয়িক কাজে টানিবার প্রস্তাব যে কত হাস্যকর তাহা সে চিন্তা করিতে পারে নাই। ঠাকুর কিন্তু তখনই রাজী হইয়া গেলেন। তাঁহার লৌকিক জীবনের চিন্তাধারা সহজ, সরল খাতে প্রবাহিত, ভক্তেরা তাঁহার আত্মজন। লোকান্তরিত ভক্তটির যখন তিনি ছাড়া আর কোন নিকটাত্মীয় নাই, একাজ ত' তাঁহাকেই করিতে হইবে। পরের দিন বেলা ১০টার আগেই তাঁহার খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল। জামা জুতা পরিয়া তিনি প্রস্তুত। সেই ছেলেটির প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। আর বার বার ঘড়ি দেখিতেছেন, আদালতের জরুরী কাজ আরম্ভ হইতে বিলম্ব না হয়।

এমন সময় ঠাকুরের স্নেহাস্পদ ভক্ত ডক্টর প্রভাত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের সহিত বরাবরই প্রভাত-বাবুর ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। এই অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তা-বোধের বলে পরমারাধ্য গুরুকে তিনি দেখিতেন এক "বৃদ্ধ শিশু" রূপে। লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে ঠাকুরকে অনেক সময় এই পরম আপনজনের শাসন ও বাক্যবান সহ্য করিতে হইত। ঠিক এই সময়ে কোর্টে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রভাতবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া ঠাকুর অপরাধী বালকের মত জড়সড় হইয়া পড়িলেন, আবার কি এক হাঙ্গামা বাধিয়া বসে কে জানে। প্রভাতবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সময়ে কোথায় বেরুচ্ছেন ?" ঠাকুর নিরুত্তর। "বলি, সাত-তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে, কোথায় যাবেন ? কি চুপ করে রইলেন যে ?"

তবুও কোন সাড়াশব্দ নাই। এই নীরবতায় প্রভাতবাবু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখনই পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া তিনি মহা সোরগোল তুলিয়া দিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়া যাইবার জন্য ইতিমধ্যে সেই যুবকটি আসিয়া উপস্থিত। তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, প্রভাতবাবু ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। কঠোর ভাষায় তিনি তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। ছেলেটি ইতিমধ্যে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। এরূপ বৈষয়িক কাজে ঠাকুরের মত সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে টানাটানি করা সত্যই বড় গর্হিত হইয়াছে। অপর যে কোন লোক দিয়াই ইহা করানো যায়—একথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। অনুতপ্ত হৃদয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়া কহিল, "আমায় আপনি ক্ষমা করুন। আমি এতটা বুঝিতে পারি নাই। এ আমার বড় অবিবেচনার কাজই হইয়াছে।"

ঠাকুর তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "না—না, কোন অন্যায়ই তাহার হয় নাই। প্রভাতবাবু ঠাকুরের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল। তাই এত উত্তেজিত হইয়াছেন। সে যেন ব্যথিত না হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর শক্তি ও জ্ঞানের অসীম উচ্চশিখরে আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ঐসকল ঐশর্য্য সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সকলের সঙ্গে কিভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন এবং কিরূপ আচার ব্যবহার করিতেন তাহা উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেবল মানুষের সঙ্গে কেন, অন্য জীবজন্তুর সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গভাব পরিলক্ষিত হইত। ঠাকুর ছিলেন মহাপ্রাণ অর্থাৎ অখণ্ড সত্তার অধিকারী। তাই শুধু মানুষই নয়, বিশ্বের সকল প্রাণীর

সহিতই ছিল তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তার যোগ। তিনিও তাহাদের বুঝিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে বুঝিত। ঠাকুর বলিতেন, "নিজের মধ্যে হিংসা না থাকিলে অপরেও হিংসা করে না।" ইন্দুবাবু তাঁহার প্রণীত "রামঠাকুরের কথা"য় একস্থানে লিখিয়াছেন, "একদিন প্রসঙ্গক্রমে ( ঠাকুর ) আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রাণের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারিলে সকল প্রাণই আত্মীয় হইয়া যায়, কাহারও সহিত আর কোন বাদবিসম্বাদ থাকেনা। প্রাণ মূলতঃ এক, আধার ভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। যেমন ইলেকট্রিক বালব নানা প্রকারেরই হইতে পারে, ৫, ১০, ৫০, ৬০, ১০০, ৫০০, ১০০০, প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির হইতে পারে, বড় ও সাদা, লাল, হলুদ, প্রভৃতি নানা রকমের হইতে পারে কিন্তু যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইহারা জ্বলে তাহা একই, প্রাণও ঠিক তদ্রূপই। বিভিন্ন জীবে আবরণ ভেদে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুটি এক এবং এই প্রাণকে স্বরূপতঃ বুঝিতে পারিলে যাবতীয় প্রাণীকেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই মিত্রভাবের ভিত্তি।" একখানি পত্রে ঠাকুর লিখিয়াছিলেন "মিত্রভাব সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন, ঈশ্বরকে ভালবাসা, সকলের মধ্যেই আত্মার মত অর্থাৎ আপন শরীরে যেমন সুখ দুঃখ অনুভূতি হয়, তদ্রূপ পরদেহে আপন দেহের মতন সুখ দুঃখ বোধ করিতে পারিলে মিত্রভাব হয়। ইহাই প্রেম বলে, পরহিতে রত ইহাই মিত্রভাব। ইহাই যদি স্থায়ী হয় তাতেই সর্ব্বদা মিত্রভাবে ভগবানকে পায়।" ( বেদবাণী ২য় খণ্ড ১৩৬ নং )

কেবল জীবজন্তু কেন, বৃক্ষ তরুলতা এমনকি দূর্ব্বাআদি তৃণগুচ্ছেও

একই প্রাণসত্ত্বা বিদ্যমান। ঐ প্রাণশক্তি বহির্গত হইয়া গেলে জীবজন্তুর দেহ যেমন একেবারে অসাড় হইয়া ক্রমে পচিয়া গলিয়া যায় তেমন তৃণগুচ্ছাদিও প্রাণ বিহীন অবস্থায় শুকাইয়া যায়। এই একই সত্তার ক্রিয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বলিয়া পূর্ণ অনুভূতি সম্পন্ন শ্রীশ্রীঠাকুর গাছের ফুল ছেঁড়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সময় সময় তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছেন "গাছের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া নিলে গাছের কি কোন কষ্ট হয় না ?" কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ শক্তি ছিলেন বলিয়াই কোন বিধিনিষেধের মধ্যে ছিলেন না। সুতরাং স্পষ্টভাবে কোন আদেশ দিতেন না। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহার এই প্রকার ইঙ্গিতকে নির্দ্দেশ বা আদেশ মনে করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

উপরোক্ত কথাগুলির মর্ম্ম ও সত্যতা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াসী হইয়া বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ্যদর্শী ব্যক্তিদের নিকট হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত কয়েকটি সত্য, অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যদিও "অসম্ভবং ন বক্তব্যং" এই মহামূল্যবান উপদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতার উপসংহারেও বলিয়াছেন যে, গুহ্যতম কথা সকলের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। তথাপি আমার এই পুস্তক যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ভগবৎ বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান মনে করিয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশানুযায়ী ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের ও অন্যান্য তিনটী ধামের মোহান্ত

LIBRARY
No.... [ ৪৭ ]
S... ...ve Ashram
BANARAS

মহারাজ পদে বহু বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী জানিতে পারিয়াছি। ইন্দুবাবুও পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার প্রণীত "রামঠাকুরের কথা"য় ঐ ঘটনা দুইটী নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "শ্যামদা একবার কাশীতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঠাকুর কাশী শহরের বাহিরে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। অনেক কষ্টে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্যামদা' সেই বাড়ীটী বাহির করিলেন। শ্যামদা' দেখিলেন যে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটী সরিয়া গেলেন, শ্যামদা' আর কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি ধরিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সম্মুখেই একখানা ঘর, খোলা দরজার নিকট যাইতেই দেখিলেন যে ঠাকুর বসিয়া আছেন এবং প্রকাণ্ড একটা সাপ ঠাকুরের সারা অঙ্গ জড়াইয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর মাথাটী রাখিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। শ্যামদা'কে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন: "আপনে এখানে কেন? শীগ্‌গির চলিয়া যান।" উত্তরে শ্যামদা' বলিলেন যে ঠাকুরের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন এবং তখনই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু যাইবার পুর্ব্বে একবার ঐ সাপের কথাটা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন যে তাঁহার জ্বর হইয়াছে এবং নিকটে কেহই নাই দেখিয়া এই সাপটী আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। এই কথার পর শ্যামদা' আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, দরজা হইতেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আরও একটি ঘটনার কথা শ্যামদা'র মুখে শুনিয়া-

ছিলাম। তিনি এবং আরেকজন ভদ্রলোক ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে কোথায় যেন যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা বানর সঙ্কীর্ণ রাস্তাটী আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই অঞ্চলের বানরগুলি অত্যন্ত হিংস্র, সুতরাং শ্যামদা' এবং তাঁহার সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটী স্বভাবতঃ একটু ভীত হইলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন যে, কোন ভয়ের কারণ নাই। বানরটা কিছুই করিবে না এবং আগাইয়া চলিলেন। ঠাকুর ঐ বানরটীর নিকটে আসিতেই শ্যামদা' ও তাঁহার সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং পরে ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল।" আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, ঠাকুর ঐদিন রাহাপাড়া ভক্ত চন্দ্রমোহন শীল কবিরাজের বাড়ীতে যাইতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনুমানিক ২৫ বৎসর বয়সে নোয়াখালী শহরের পূর্ব্বাংশে এক বাড়ীতে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় একদিন তিনি ঐ শহরের পশ্চিমাংশে এক বাড়ীতে হরি সংকীর্ত্তন উপলক্ষ্যে একটী মাঠের মধ্য দিয়া আরও দুই তিনজন সঙ্গীসহ যাইতেছিলেন। ঐ মাঠেই তখন নোয়াখালী জজকোর্ট নির্ম্মাণের জন্য বহু ইট স্তূপীকৃত ছিল। ঐ ইঁটের স্তূপের পার্শ্ব দিয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ একটী বিষধর সাপের গায়ের উপর পা পড়ায় তৎক্ষণাৎ সাপটী তর্জ্জন করিয়া ঠাকুরের পা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সঙ্গীয় ভদ্রলোকেরা চমকিত হইয়া ভয়ে একটু দূরে সরিয়া পড়িলেন কিন্তু ঠাকুর স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বলিলেন যে তিনি না জানিয়া তাহাকে ব্যথা

PRESENTED

দিয়াছেন, সে যেন ক্ষমা করে। এই কথার পর সাপটী তাঁহার পায়ের বেষ্টন মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল। এই ঘটনার বিষয় আমি বাল্যকালে নোয়াখালীতে শুনিয়াছি এবং তুই তিন মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছি যে তৎকালে নোয়াখালী প্রবাসী কলিকাতার উপকণ্ঠের উত্তরপাড়া নিবাসী এক ভদ্রলোকের মুখে এই ঘটনার বিষয় তিনি স্বয়ং শুনিয়াছেন। ঠাকুর সম্পর্কে ফেনীর মহকুমা হাকিম কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও লিখিয়াছেন "সর্প দংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রামঠাকুর বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে।" নিজের মনে হিংসা না থাকিলে অন্যান্য জীবজন্তুরা যে হিংসা করেনা বরং সময় সময় নানাভাবে সেবাই করে তাহা ইন্দুবাবু স্বয়ং ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়া "রামঠাকুরের কথা"য় যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠাকুর একবার বৃন্দাবনে থাকাকালীন বাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, হাঁটু তুটি ফুলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়াছিল। শুশ্রূষা করিবারও কেহই সেখানে ছিলনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যন্ত্রণা তুঃসহ হইয়া উঠিত, তখনই কোথা হইতে এক বৃহদাকার হনুমান ঠাকুরের ঘরে ঢুকিয়া খানিকক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিয়া যাইত এবং ঠাকুরের যন্ত্রণারও অনেকটা উপশম হইত। এমনকি কুঁজা হইতে গ্লাসে জল গড়াইয়াও ঠাকুরকে খাইতে দিত। ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিনই হনুমানটী তিন চারবার এইভাবে আসা যাওয়া করিত। কিন্তু ঠাকুর যেদিন রোগমুক্ত হইলেন সেইদিন হইতে আর ইহাকে দেখা যায় নাই।"

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আর একটী ঘটনার বিষয়ও বলিয়াছিলেন তাহা ইন্দুবাবু নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ভবানীপুর বকুল বাগানে কোনও এক মুখুজ্যে পরিবারের একটি বাগানবাড়ী ছিল, সেখানেই বাগানের এক কোণে একখানা মাটীর ঘরে এক ভদ্রমহিলা বাস করিতেন। ইনি ছিলেন ঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা এবং ঠাকুর ইহাকে 'দামিনীমা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 'দামিনীমা' সপ্তাহে একদিন কি তুইদিন প্রাতঃকালে তুইটী ভাতেভাত সিদ্ধ করিয়া খাইতেন আর বাকী কয়দিন শুধু জল খাইয়াই কাটাইয়া দিতেন। ঠাকুর কখনও কখনও এই 'দামিনীমা'র নিকটে আসিয়া থাকিতেন। 'দামিনীমা'র তুইটী বিষধর কালসর্প ছিল, তাহারা এই ঘরেই থাকিত এবং তিনি তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন "কানাই, নিতাই।" ঠাকুর বলিতেন যে যেদিন দ্বিপ্রহরে রৌদ্র একেবারে ঝাঁ, ঝাঁ করিয়া উঠিত এবং অসহ্য গরম সকলকে অস্থির করিয়া ফেলিত, তখন এই কানাই নিতাই ধীরে ধীরে আসিয়া ঠাকুরের গায়ের উপর শুইয়া থাকিত। ঠাকুরকে এই গ্রীষ্মাতপের মধ্যে খানিকটা আরামে রাখাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা সহজেই বুঝা যাইত।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে এই প্রকারের ঘটনার ইয়ত্তা নাই কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় আর বেশী উল্লেখ করা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

## অপরের দেহ হইতে নিজ দেহে রোগ আকর্ষণ করা

পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারও সকরুণ প্রার্থনায় সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। বহুলোকের নানাপ্রকার অশেষ যন্ত্রণা-

দায়ক ব্যাধি যোগবলে, কি অন্য কোন উপায়ে নিজদেহে আহরণ করিয়া স্বয়ং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগান্তে রোগঋণ শোধ করিয়া তিনি রোগীদের চিরতরে রোগমুক্ত করিয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁহার ভক্তদের মধ্যে কেহ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত এইসকল রোগযন্ত্রণা এড়াইতে পারেন। এমতাবস্থায় অত যন্ত্রণা অনর্থক ভোগ করেন কেন? তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে তাহা হইলে ত' রোগঋণ শোধ হয় না। ঐশ্বর্য্যবলে কোন ব্যাধি নিরাময় করিলে সেই রোগঋণ জমা হইয়া থাকে। রোগী সাময়িক আরোগ্যলাভ করিলেও একদিন না একদিন সুদে-আসলে তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। ভোগ ব্যতীত অলঙ্ঘ্যনীয় প্রারব্ধ-দণ্ড খণ্ডন হয় না। ঠাকুর ঐ প্রারব্ধ-সম্ভূত রোগঋণ, স্বয়ং নিজদেহে ভোগদণ্ড গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিলে আর ত রোগীর ঋণদায় থাকিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ সম্পর্কে তাহার আর কোন দণ্ডভোগ হইবে না—ইহা সুনিশ্চিত। এই প্রকার পরদেহ হইতে রোগ আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বয়ং অশেষ ভোগ-যন্ত্রণা করার বহু ঘটনা তাঁহার ভক্তগণের জানা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই, তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

বিগত মহাযুদ্ধের আরম্ভে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিন চাঁদপুর ছিলেন। আমি ঐ সময় পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রম হইতে সংবাদ পাইলাম ঐ আশ্রম সংলগ্ন উপরের পাহাড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশে নির্ম্মিত আমার বাড়ীখানা গভর্ণমেণ্ট সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য রিকুইজিসন্ ( requisition ) করিতে চাহিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি তাহার বিরুদ্ধে তদ্বির করার জন্য চট্টগ্রামের পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের

শ্রীচরণ স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে চাঁদপুর যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া শুনিলাম যে ঠাকুর হঠাৎ ভীষণ ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় মিনিটে মিনিটে মলত্যাগ করিতেছেন এবং অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতেছেন। পরিচর্য্যাকারীগণ ব্যতীত অন্য কোন লোকের তাঁহার নিকটে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এমতাবস্থায় তাঁহার নিকটে যাইতে আমি খুবই দ্বিধার মধ্যে পড়িলাম। অথচ আমার অবিলম্বেই চট্টগ্রাম যাওয়া একান্ত দরকার। এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া অগত্যাপক্ষে একমিনিটের জন্য আমি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী এই সংবাদ ঠাকুরকে দেওয়ায় তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তথায় যাইয়া তাঁহার অত্যন্ত কাতর অবস্থা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন অবর্ণনীয় রোগক্লিষ্ট অবস্থায়ও আমি তাঁহার চিরাভ্যস্ত অতি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলাম না। আমার চট্টগ্রামে যাওয়ার কারণ জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন এবং আমার উপস্থিতির সময় একটুও কষ্ট পাইতেছেন—এমন ভাব দেখাইলেন না।

রোগের অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীজে, এম, দাশগুপ্ত মহাশয়কে টেলিগ্রাম দেওয়া হয়। তিনি প্রভূত অর্থব্যায়ে চিকিৎসার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া আসেন। তথায় সর্ব্বপ্রকারে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা সত্ত্বেও অসহ্য যন্ত্রণা ও অনবরত একটু একটু মলত্যাগ বন্ধ হইল না। এই রোগ চিকিৎসার

জন্য কলিকাতাতে যাহা কিছু করা সম্ভব তাহার সকল ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ঠাকুরের অসুখের উপশম হইতেছিল না। প্রায় ৮।১০ দিন তথায় অতি কাতর অবস্থায় কাটাইয়া একদিন হঠাৎ ঠাকুর অত্যন্ত ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন যে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিবেন না। তৎপর তাঁহারই আদেশে তথায় উপস্থিত ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মোটর গাড়ীতে ধরাধরি করিয়া ঠাকুরকে কোন রকমে তুলিয়া তাঁহার ভক্ত কবিরাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে আনা হইয়াছিল। ঐ সময় যাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রতাপ বাবুর বাসায় পৌঁছাইবার পরই একবার মলত্যাগের পর ঠাকুরের অসুখ যেন আপনা হইতেই অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। কোথায় বা গেল বেডপ্যান, কোথায় বা গেল তূলার প্যাড আর কোথায় বা গেল ওষুধপত্র। পরের দিন ঠাকুর সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় ভক্তদের দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শরীরের অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ধারণাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরে জানা গিয়াছে যে, চাঁদপুরে এক ব্যক্তি ঐ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয়স্বজনের কাতর প্রার্থণায় বিগলিত হইয়া দয়াময় ঠাকুর ঐ রোগ নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অবিলম্বে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া স্বয়ং অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে আরও দুইটি অতি চমকপ্রদ ঘটনা বেদবাণীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

বেদবাণী সঙ্কলয়িতা ইন্দুবাবু লিখিয়াছেন "একদিন আমার ৫৬সি, বীডন ষ্ট্রীটের বাসায় বৈঠকখানা ঘরে প্রাতঃকালে আমি ও ঢাকার শক্তি

ঔষধালয়ের কবিরাজ ৺জানকীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। আমরা এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। উভয়ে দেখিলাম যে, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে কতকগুলি গুটি উঠিয়া ঠাকুরের দুই হাত ও বুক ছাইয়া ফেলিল। কবিরাজ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এগুলি বসন্তের গুটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিকিৎসক বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল। আমাকে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন যে, শীঘ্রই ঠাকুরের জন্য ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া যাইতেই ঠাকুর মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন ঃ "উনি ঠিকই বলিয়াছেন ; এইগুলি বসন্তেরই গুটি। কিন্তু উনি অনর্থক ভীত হইয়াছেন। ঔষধের প্রয়োজন হইবেনা এবং ইহা হইতে কাহারো কোন অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর আঙ্গুল দিয়া গুটিগুলি আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘণ্টাখানেক পরে ঐগুলি নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। আমি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে ঠাকুর স্বীকার করিলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এক মরণাপন্ন বসন্তের রোগীকে নিরাময় করিয়াছিলেন এবং সেই রোগ এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ভীষণ বাতের যন্ত্রণায় ভুগিতেন সেই সম্বন্ধেও আর একজন ভদ্রলোক বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া কারণ জানিতে চাহিলে ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছিলেন যে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়ের নিকটে কোনও এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে সেই ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও দশ

৭/৩২৫



বৎসর বয়স্ক এক পুত্র লইয়া বাস করিতেন এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে ঠাকুরকে তাঁহারা নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের একমাত্র সন্তান বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং তাহার শরীরের বামার্দ্ধ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া যায়। ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় কোনও ফলই হইল না। তখন সেই ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া পড়িলেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে ঠাকুর ইচ্ছা করিলেই একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন। কিছুতেই ঠাকুর ইহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। একদিন রাত্রিতে নিকটস্থ গঙ্গার এক চরে কাশ বনের মধ্যে তিনি আসন করিয়া বসিলেন। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটি আরোগ্য হইয়া গেল এবং তাহার শরীরস্থ বাত আসিয়া ঠাকুরের দেহে আশ্রয় করিল। ঠাকুর একেবারে নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া গেলেন, সামান্য একটু নড়া-চড়া করিবার ক্ষমতাও তাঁহার রহিল না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর ঠাকুর দেখিলেন যে তাঁহার গুরুদেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোনও কথা না বলিয়া তিনি ঠাকুরের পিছনে চলিয়া আসিলেন এবং হঠাৎ এক লাথি মারিয়া তাঁহাকে প্রায় চোদ্দ পনের হাত দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতেই ঠাকুরের আড়ষ্ট হাত পা ছাড়িয়া গেল। গুরু ঠাকুরকে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। কিন্তু ঠাকুর স্বাভাবিক-ভাবে হাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হামাগুড়ি দিয়া আসিতে হইল। ইহা দেখিয়া গুরু বলিলেন, "একটু দোষ থাকিয়াই গেল। দেহ যতদিন আছে, ততদিন মাঝে মাঝে এই বাতের আক্রমণে ভুগিতেই হইবে।"

ঠাকুরের আশ্রিতগণের মধ্যে এই প্রকারে ঠাকুরর নিজে দেহে অপরের রোগ ভোগের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি দেহ ত্যাগের পরও যে তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ দানে নিরাময় করিয়াছেন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

বর্তমানে যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের সেবায় রত শ্রীমান মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় একবার অতি ভীষণ মারাত্মক বসন্ত রোগ হইতে কল্পনাতীতভাবে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ-ত্যাগের প্রায় তিন বৎসর পর ১৩৫৮ বাং সনের ফাল্গুন মাসে মনোরঞ্জন পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় সে তথায় রায় সাহেব ডাক্তার অনাথবন্ধু সেন মহাশয়ের পার্শ্বের কামরাতে শয়ন করিত। দুই তিন দিন পরেই ডাক্তারবাবু তাহার রোগ সাংঘাতিক ধরণের বুঝিতে পারেন। তিনি তাহাকে একটি পৃথক স্থানে Segregate অর্থাৎ, আলাদা করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে তৎকালীন আশ্রমের মোহন্ত মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে আশ্রমের পাহাড়ের একটু নিম্নভাগে স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায়ের মায়ের শ্মশানের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর পচিয়া উঠিতে লাগিল এবং ঐ দুর্গন্ধ এমনই তীব্র হইয়া উঠিল যে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ও নিকটস্থ কামরাগুলিতে থাকাও দুষ্কর হইয়া উঠিল। সকলেই মনোরঞ্জনের বাঁচিবার আশা একেবারেই ত্যাগ করিল। আশ্রমের তৎকালীন কীর্ত্তনীয়া, অক্লান্ত কর্মী শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ও পরম

LIBRARY



শ্রদ্ধেয়া প্রিয়ভাষিনী দিদি ঘৃণা ভয়াদি তুচ্ছ করিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাহার আত্মীয়-স্বজনাদি সকলেই নৈরাশ্যে ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বহুদূর হইতে তাহার সংবাদ লইত কিন্তু কেহই খুব নিকটে যাইতে সাহস করিত না। রোগী প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় অনেকদিন অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

এমন সময় উপরোক্ত প্রফুল্ল একদিন শেষরাত্রে ভোর হওয়ার অল্প পূর্ব্বে কৈবল্যকুণ্ডের পূর্ব্ব ধার দিয়া উত্তর দিকে যাওয়ার সময় দেখিতে পায় যে উত্তরদিক হইতে শুভ্র কেশ সাদা পাঞ্জাবি ও সাদা লুঙ্গি পরিহিত এক বৃদ্ধ আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? এইদিকে কোথা হইতে আসিতেছেন?" আগন্তুক উত্তর করিল, "আমি এইখান হইতে আসিতেছি।" তখন প্রফুল্ল বলিল, "আপনি কি পায়খানা হইতে আসিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "না, এইত' উত্তর দিক হইতে আসিতেছি।" তখন প্রফুল্ল রাগতভাবে বলিল, "আপনি কি ট্যাংরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে আসিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি রোগীর নিকট হইতে আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল স্তব্ধ হইয়া গেল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল;—যে রোগীর নিকট কেহ যায় না তাহার নিকট এইভাবে শেষরাত্রে গেলেন,—ইনি কে? এইকথা মনে আসিতে না আসিতেই যেন ঐ চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "রোগীর অবস্থা কেমন?" আগন্তুক বলিলেন, "রোগীর অবস্থা ভাল নয়।" তখন প্রফুল্ল বলিল, "কোনও ডাক্তার

কবিরাজ আসে না। আসিলেও দূর হইতে এই বলিয়া চলিয়া যায় যে ইহার অবস্থা তাহাদের চিকিৎসার বাহিরে। এমতাবস্থায় ইহার কি-ই ব্যবস্থা করা যায়?" তখন ঐ বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনার নিকট কোন কাগজ আছে?" প্রফুল্ল বলিল, "না, আমার নিকট কোনও কাগজ নাই।" মাটির উপর কোন কাগজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে চারিদিকে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল যে, একটু কাগজ কুঁচকানো অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন সে ঐ কাগজের পুঁটলীটি তুলিয়া লইল এবং তাহাকে লেখার উপযোগী করার জন্য টানিয়া অনেকটা সোজা করিয়া লইয়া বলিল; "কাগজ ত' পাইলাম, কিন্তু কি দিয়া লিখিব, কলম ত' নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন "আমার নিকট হইতে কলম নেন।" এই বলিয়া একটি ফাউণ্টেনপেন প্রফুল্লের হাতে দিয়া বলিলেন "আপনি লিখিতে পারিবেন?" প্রফুল্ল উত্তর করিল, "হ্যাঁ, পারিব।" তখন তিনি ওষুধের বস্তুগুলি উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল লিখিতে আরম্ভ করিলেই কাগজ চুপসাইয়া যাইতে লাগিলে সে বলিল; "কাগজ ত' চুপসাইয়া যায়। আপনি মুখে বলিয়া দিন। মুখে বলিয়া দিলে মনে থাকিবে ত?" বৃদ্ধ বলিলেন "মনে থাকিবে।" ইহা বলিতে প্রফুল্ল কলমটি তাঁহাকে ফেরত দিল। তৎপর তিনি বলিলেন: "কালিজিরা ও মেথি সমপরিমানে লইয়া একটি পাকা কলার সঙ্গে জলছাড়া বাটিয়া ক্ষতস্থানগুলিতে দিনে তিনবার লাগাইবেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে প্রফুল্ল চমকিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে ঠাকুর মন্দিরে উষাকালে ঠাকুর জাগ্রত করার শঙ্খ

ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাইল। তখন সে আস্তে আস্তে আসিয়া মঙ্গলারতি কীর্ত্তনে যোগ দিল।

উপরোক্ত অপরিচিত বৃদ্ধের নির্দ্দেশানুযায়ী ঐদিনই প্রাতে ও মধ্যাহ্নে প্রফুল্ল রোগীর সমস্ত ক্ষতস্থানে অতিকষ্টে প্রলেপ লাগাইয়া দিল। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ক্ষত হইয়াছিল রোগীর Scrotum এ (অণ্ডকোষে)। উহা ফুলিয়া একটি ছোট ফুটবলাকার ধারণ করিয়াছিল এবং নানা-স্থানে ফাটিয়া অনবরত তাহা হইতে পাতলা পুঁজমিশ্রিত জলস্রাব হইতেছিল। দুইবার অতিকষ্টে ন্যাকড়ার সাহায্যে ঔষধ প্রলেপের পর প্রফুল্ল বিকাল বেলায় পুনঃ প্রলেপ দিতে যাইয়া দেখিল যে Scrotum টি সম্পূর্ণ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং রোগীর সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ইহা দেখিয়া সে অত্যন্ত ভয়বিহ্বল চিত্তে আশ্রমবাসীগণকে সংবাদ দিলে, সকলেই বলিতে লাগিল যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রোগী ইহলীলা সংবরণ করিবে। প্রফুল্ল অতিকষ্টে প্রায় দুইসের ওজনের ঐ দুর্গন্ধময় পচা মাংস-পিণ্ডকে কম্বলে জড়াইয়া বহুদূরে নিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই রোগীর প্রাণ আছে দেখিয়া একটি হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বালাইয়া ঐ শশ্মান-মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। তৎপরদিন রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বোধ হওয়ায় ক্রমশঃ উপরোক্ত প্রলেপ নিয়মিতভাবে দিতে দিতে রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিল। শরীরের বহু স্থান পচিয়া ক্ষত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তাহার শরীরের কোন স্থানে ইতিপূর্ব্বে বসন্ত হওয়ার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখা যায় না এবং তাহার শরীর খুব সুস্থ ও সবল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত কথাগুলি আমি শ্রীমান প্রফুল্লের মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গত ভাদ্র মাসে শুনিয়া এবং পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের তৎকালীন বাসিন্দাগণের সঙ্গেও আলোচনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই সম্পর্কে বর্তমান আশ্বিনমাসে শ্রীমান মনোরঞ্জনের সহিত যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে আলোচনা করিয়া সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীমান মনোরঞ্জন আমাকে বলিল যে, যখন বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাহাকে শশ্মান মন্দিরে নিয়া রাখা হয়, তখন সে নিজকে একান্ত অসহায় মনে করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছিল। তাহাকে তথায় রাখার প্রথম দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাহার কোন ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ক্রমে যখন বসন্তের ক্ষতে তাহার শরীরের নানাস্থান পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহার সেবাকারীগণ সন্ধ্যার পর ঐ মন্দিরে আলো জ্বালাইয়া বাহিরে দরজাতে তালা লাগাইয়া যাইত; কারণ, অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে শৃগাল ও ব্যাঘ্রাদি নানা হিংস্র জন্তু ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া হয়ত তাহার শরীরের অনেক অংশ খাইয়া ফেলিবে। এই প্রকার বাহির হইতে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীনও শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে আশ্বাস দিয়া যাইতেন। এমন কি, শরীরে ঔষধের প্রলেপাদি কিভাবে দিতে হইবে, তাহা শ্রীমান প্রফুল্লকে বলার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া যাইতেন। প্রফুল্ল তদনুযায়ী কার্য্য করিত ;—ইহা প্রফুল্ল স্বয়ং

আমাকে জানাইয়াছে। এই ভীষণ রোগাক্রান্ত মনোরঞ্জনকে যাহারা ঐ সময় দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই মনোরঞ্জন কল্পনাতীত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু মনোরঞ্জন স্বয়ং আমাকে জানাইয়াছে যে, পরম দয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার কৃপায় সে ঐ সময় যে শান্তি ও আনন্দে সময় কাটাইয়াছে, ঐরূপ আনন্দ এযাবৎ সে কখনও অনুভব করে নাই। তাহার শরীরের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না বলিয়া সে অনেক সময়েই বোধ করিত।

তাঁহার দেহত্যাগের পর ঠাকুর আমাদের নিকটে নাই বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস যে একেবারেই ভুল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট মনে করিয়া আমি বিস্তারিতভাবে এই অলৌকিক ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম।

নিজকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিয়া ঠাকুরকে আকুলপ্রাণে ডাকিলে তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বেও বহু শত মাইল দূর হইতেও অপ্রত্যক্ষে রোগমুক্ত করিয়া শান্তি দিতেন। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

১৩৩২ বাং সনে পৌষ কি মাঘ মাসে আমার স্ত্রী প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ অবস্থায়ই পয়লা ফাল্গুন তারিখে আমার বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান হিরন্ময় প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার মায়ের অবস্থাও ক্রমশঃই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। সেই সময়ে তাহার নিয়ত চিকিৎসক নোয়াখালীর তৎকালীন সিভিল-সার্জ্জন ডাক্তার ষোড়শীলাল সরকার তাহাকে চিকিৎসার জন্য

কলিকাতা পাঠাইতে বলেন। কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে ঐ জিলার একজন বিখ্যাত কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইবার জন্য উপদেশ দেন। আমি অনোন্যোপায় হইয়া গুরুভ্রাতা কলিকাতাবাসী মতিলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্ত কথা বলিয়া, চিকিৎসার জন্য যথাবিহিত উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমাকে জানাইবার জন্য পত্র দিলাম।

তদুত্তরে মতিবাবু আমাকে জানাইলেন যে, ঠাকুর আমার পত্রের বিষয় জানিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই বাতরোগে অত্যন্ত অসুস্থ, সুতরাং এবিষয়ে তিনি আর কি উপদেশ দিবেন। আমি ঐ উত্তরে মোটেই শান্তি পাইলাম না। আমার বারংবার মনে হইতেছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাকে যথাবিহিত উপদেশ দিতে পারেন। কারণ কয়েকমাস পূর্ব্বে পূজার বন্ধে তাঁহার সঙ্গে প্রায় একমাস থাকিয়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দেহ বা তাহার রোগ-ভোগ তাঁহার নিকট কিছুই নহে।

আমি পুনঃ মতিবাবুকে লিখিলাম তিনি যেন ঠাকুরকে বলেন যে, কোন রোগের দরুন ঠাকুর আমাকে উপদেশ দিতে অক্ষম, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে ঐ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ দিতেই হইবে। বাস্তবিকপক্ষে দৃষ্টতঃ আমার এই অন্যায় আবদার কার্য্যকরী হইল। ঠাকুর আমার স্ত্রীকে কলিকাতা পাঠাইবার অনুমতি দিলেন। আমি স্বয়ং ঐ সময় নোয়াখালী ত্যাগ করিতে অপারগ হওয়ায় আমার মেজদা শ্রীসুখময় দত্ত ও আমাদের একটি পুরাতন চাকরকে

সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম এবং কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া তাঁহাকে যেরূপ অসুস্থ অবস্থায় দেখিলাম, তাহাতে আমার বাক্যস্ফূরণ প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। ভীষণভাবে বাতাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পা দু'খানি হাঁটু অবধি অত্যন্ত ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে হাত কি মাথা স্পর্শ করান দূরের কথা আমার মাথার চুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করিলেও তিনি ব্যাথা পাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় অতি সন্তর্পনে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা করিবেন না। হয় এক, ওরা বলে আর।" তাঁহার এই আশ্বাস বাণীতে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম এবং আমার স্ত্রীকে জানাইলাম ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন যমের বাবারও সাধ্য নাই যে তাহাকে এবার নিতে পারে।" আমার ঐরূপ বলার কারণ এই যে আমি জানিতাম ঠাকুর ভবিষ্যতের সকল কথাই অনায়াসে বলিতে পারেন যদিও তাঁহার আলাপ ব্যবহারে ঘুনাক্ষরেও তাঁহার ঐরূপ শক্তি থাকার পরিচয় দিতেন না। কেহ ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেন কিছুই জানেন না এইরূপ উত্তরই দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি কোন কথা বলার পূর্ব্বেই যখন নিজ হইতে ঐ কথা বলিয়া ফেলিলেন, তখন ঐ বিষয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ রহিল না। কয়েকদিন পরেই কিছু ঔষধপত্র নিয়া আমরা নোয়াখালী ফিরিয়া আসিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত তালিকানুযায়ী প্রস্তুত ঔষধ মালিশ করায় রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া গেল।

১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রীতিময় তাহার মায়ের সঙ্গে আমার শশুর বাড়ীতে যাইয়া ভীষণ ইরিসিপ্লাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া আমরা সকলেই খুব ভীত হইলাম এবং সিভিল সার্জ্জন ও অন্যান্য দুইতিনজন ভাল ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিলাম। তাহারা অপারেশন-আদি যথাসাধ্য চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে না পারায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। এদিকে এই ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালক ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে, "ঠাকুর, ঠাকুর, আর পারি না," বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা না হয় নাই শুনিলে, কিন্তু এই শিশুর আকুল আবেদনও কি শুনিতে পাও না।" ঠাকুর তখন কোথায় ছিলেন আমরা কেহই জানিতাম না।

শহরে দুইটি রোগী কিছুদিন পূর্ব্বে ইরিসিপ্লাস রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ডাক্তারগণ আরোগ্যের ভরসা ছাড়িয়া দেওয়ায় আমি একেবারেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ডাক্তার শ্রীমান ধীরেন রায় সহ রাত্রি দশটার গাড়ীতে আমি সপরিবারে চট্টগ্রাম রওনা হইলাম।

রাত্রে ট্রেনে শ্রীমান কোন অস্থিরতা দেখায় নাই এবং ভোরে গাড়ী সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছাইলে সে উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা তাহাকে উঠাইয়া বসাইলাম। তাহার মুখে ইরিসিপ্লাস হওয়ায় সমস্ত মুখ অতি অস্বাভাবিকভাবে ফুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে

অনেকগুলি অপারেশন করায় তাহা ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থায় এক বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়াছিল।

চট্টগ্রামে দাদার বাসায় পৌছানোর অল্প পরেই তথাকার ইংরেজ সিভিল-সার্জ্জন ও বিখ্যাত সার্জ্জন রায়বাহাত্বর জ্ঞানচন্দ্র চ্যাটার্জী আসিয়া শ্রীমানকে খুব ভাল করিয়া দেখিলেন এবং রোগের আত্মোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। তাঁহাদের মুখের চেহারায় আমার মনে হইল তাঁহারাও রোগ সাংঘাতিক বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি সিভিল-সার্জ্জনকে একাকী একস্থানে নিয়া সরলভাবে রোগীর অবস্থা জানাইতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "I can't say even now that the case is very hopeful, but the boy got admirable treatment at Noakhali Let us see what we can do for him." ইহার পর কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা হতাশ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার অপার কৃপায় ছেলের অবস্থা ক্রমশঃ ভালর দিকে যাইতে দেখিয়া আমি নোয়াখালী ফিরিয়া আসিলাম।

নোয়াখালী আসার পর আমি কিন্তু ছেলের অসুখের চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসার পরদিন প্রাতে বৈঠকখানায় বসিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ছেলের অসুখের বিষয় ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কামিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়-এর নিকট হইতে একখানি ছোটপত্র একটি লোক আমাকে দিয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল,—

My dear brother,

Very anxious for your boy. Please let me know his yesterday's condition. To-day is the first day of "Sravana," & he is out of danger. From the 20th to 29th Ashar, his time was critical. Sri Sri Guru saved him. He came to Noakhali & went to Chittagong, but his present whereabouts not known. Please tear this slip into pieces.

Yours affectly,
Kamini,
17. 7. 1928.

উপরোক্ত পত্রের বঙ্গানুবাদ :—

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনার পুত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। দয়া করিয়া আমাকে তাহার গতকল্যের অবস্থা সম্বন্ধে জানাইবেন। অদ্য শ্রাবণ মাসের ১লা তারিখ এবং তাহার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। বিশে হইতে উনত্রিশে আষাঢ় পর্য্যন্ত তাহার সময় অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। শ্রীশ্রীগুরু তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নোয়াখালী আসিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থিতি জানা নাই।

দয়া করিয়া এই চিরকুটখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

আপনার স্নেহের,
কামিনী,
১৭. ৭. ১৯২৮.

পত্রখানা পাওয়ামাত্র আমার বুকের উপর হইতে যেন একটা বিরাট বোঝা হঠাৎ নামিয়া গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলিয়া তাহা বার বার পড়িয়াও যেন আমার সাধ মিটিতেছিল না। তখন অফিসে যাওয়ার প্রায় সময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ কামিনী বাবুর নিকটে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া একটু বিশ্রামের পরই কামিনীবাবুর বাসায় যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা বিস্তারিতভাবে বলিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, "ছেলের বিশে হইতে উনত্রিশে আষাঢ় পর্য্যন্ত মৃত্যুযোগ ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহা কাটিয়া গিয়াছে। ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে। সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর কি বস্তুতঃই বলিয়া গেলেন, না আপনি স্বপ্নে দেখিলেন।" তিনি বলিলেন, "আপনারা চট্টগ্রাম রওনা হইতে ঠাকুর আপনাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছেন। তারপর তিনি কোথায় গিয়াছেন, জানি না। ঠাকুরই আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, নচেৎ ঐভাবে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" তাঁহাকে এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় আমি আর জিজ্ঞাসাবাদ

করিলাম না। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় সেই দিন হইতে ছেলের ঐ রোগে মৃত্যুও হইতে পারে—এই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার কবল হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি বলিলেন, "বিন্দুর বুঝি খুব অসুখ হইয়াছিল?" আমি একটু হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আপনিই ত' তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।" এই কথা বলা মাত্র ঠাকুর ছেলের অসুখের প্রসঙ্গকে একেবারে চাপা দিয়া অন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন। আমি ঐ বিষয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার বা, বলিবার সুযোগ না পাইয়া নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অসীম যোগ ঐশ্বর্যগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিতে সকল সময় চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঐগুলির ক্রিয়া সময় সময় তাঁহার ভক্তগণের নিকট প্রকট হইয়া উঠিত। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা কিছুদিন থাকার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা যতদূর তৎকালে স্মরণ করিতে পারিয়াছি তাহা আমার প্রণীত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এই পুস্তকেও অতি সংক্ষেপে তাহা হইতে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য মনে করি।

১৩৩২ বাং সনে পূজার বন্ধে ( ১৯২৫ ইং ) আমি বিহার প্রদেশ

অন্তর্গত মুজাঃফরপুর শহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদারের বাসায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাই। তৎপূর্ব্বে রোহিণী-বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। নোয়াখালী হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়া জানিতে পারি যে, ঠাকুর মজাঃফরপুর শহরে Mr. R. K. Majumder কনট্রাক্টারের বাড়ীতে আছেন। তদনুযায়ী তাঁহাকে পত্রদ্বারা তথায় পৌঁছিবার তারিখ জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমাকে নেওয়ার জন্য ষ্টেশনে আসার পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার চেহারা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর কোন বর্ণনা না দিয়া বলিয়া দিলেন, "ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই তাহাকে চিনিতে পারিবেন!"

রোহিণীবাবুর বাসার বহির্বাটীতে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ভিতরে গিয়া দেখি যে, ভিতর বাড়ীর দালানের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন। সম্মুখে অনেকগুলি ফুল, বেলপাতা ও চন্দনাদি রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ঠাকুর এমন স্নিগ্ধ, মধুর, অবর্ণনীয় স্নেহমাখা হাসিতে সাদর আহ্বান ও আশীর্ব্বাদ জানাইলেন যে, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তৎপর পূজাদিতে অনভিজ্ঞ আমি, আমার বন্ধু রোহিণী-বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অক্ষয়বাবু যেভাবে তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাদি অর্পণ করিলেন, সেইভাবে অর্পণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম। সেদিন মহাষ্টমী পূজার দিন ছিল। প্রসাদ গ্রহণান্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমি বহির্বাটীর ঘরে যাইয়া বসিলাম। এই ঘরখানা ছিল ছোট, এক পাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের তক্তাপোষ, তাহার সামনেই আর একখানা বিছানা হইতে পারে এইরূপ স্থান

মাত্রই ছিল। ঠাকুর আমাকে ভিতর বাটিতে যাইয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, গৃহস্বামীরা আমার আপন জনই; সুতরাং লজ্জার কোন কারণ নাই। চোরের উপদ্রব হেতু আমার ট্রাঙ্কাদি ভিতর বাড়ীতে রাখাই ভাল ইত্যাদি। আমার কিন্তু ঐ ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। কারণ আমি তাহার সঙ্গে থাকার জন্যই অতদূরে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ঠাকুরের সান্নিধ্যে চোরের ভীতি আমাকে সামান্য মাত্রও স্পর্শ করিল না। আমি ঐ ঘরেই থাকিতে চাহিলাম ও শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহাতে রাজী হইলেন। আমার বন্ধুগণ ঐ ঘরেই আমার বিছানা পাতিয়া দিলে আমি ও শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় বিশ্রাম করিলাম এবং রাত্রে সেই ঘরেই আমরা দুইজন শয়ন করিলাম।

ভোরে জাগিয়া উঠিয়া দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বিছানায় মশারী তুলিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়ীতে যাইয়া হাত মুখ ধুইয়া চিরাভ্যস্ত প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম যে, আমার বাহির হইয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরও বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং প্রত্যহই তিনি ঐভাবেই বাহির হইয়া যাইতেন। রোহিণীবাবু ও অক্ষয়বাবুকে ঠাকুর কোথায় যান এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না। তবে এইটুকু বলিতে পারেন যে, তথাকার কোন লোকের বাসায় তিনি যাননা। সম্ভবতঃ তিনি কোন সুদূর প্রান্তরে চলিয়া যান এবং সময় সময় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পায়ে চন্দন ও সিঁদুরের চিহ্ন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন

LIBRARY
No. ........


এবং তাহাতে কেহ তাঁহাকে পূজা করিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমি তাঁহার পিছন পিছন যাইতে পারি কি?" তাঁহারা হাঁসিয়া উত্তর করিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখুন। কিছুদূর যাইয়া হঠাৎ দেখিবেন যে তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমি পিছনে পিছনে যাইলে যদি তিনি আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলেন?" তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে সেইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বেশীদূর যাইতেই পারিব না বলিয়াও মত প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু ঐভাবে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গতবোধ করিলাম না। তাই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আপনার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে পারি কি?" তিনি বলিলেন, 'না, তা যাওয়া যায় না।' আমি তাহাতে আর কোন জিদ্ করিলাম না। বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অশরীরি ভক্তগণ তাঁহাকে খুব সম্ভবত নিভৃত সুদূর প্রান্তরে পূজা করেন এবং সময় সময় হয়ত তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গে'ও ঐরূপ স্থানেই তিনি দেখা করেন। ঐ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়েরও কিছু ঠিক ছিল না।

মুজাঃফরপুরে ১৩ দিন থাকিয়া হুগলী-জেলাবাসী রামদাসবাবু নামক এক ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে সঙ্গে করিয়া "বালীয়া" রওনা হইলেন। সন্ধ্যার সময় 'বালীয়া' ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলাম, রামদাসবাবু আমাদের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে টাঙ্গা করিয়া তাঁহার বাসাবাড়ীতে লইয়া গেলেন। বাড়ীটি ছোট একখানা দোতলা পাকা বাড়ী। নীচের তলায় কতগুলি ঘি-এর টিন ছিল। উপরে মাত্র একখানা কোঠা

ও তাহার দুই-পার্শ্বে বারান্দা। ঐ কোঠায় একখানা তক্তপোষে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা হইলে, আমি তাহার পার্শ্বে মেজেতে আমার বিছানা পাতিলাম। রামদাসবাবু খুব সম্ভবতঃ পিছনের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া আমরা তিনজন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বেড়াইতেছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে খুব বড় বড় গাছ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এই সকল গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে খুবই ভাল লাগে।" আমি বলিলাম, "এই রাস্তা দিয়া কখনও আপনি গিয়াছেন কি?" ঠাকুর উত্তর করিলেন তিনি ঐ স্থানে আর কখনও আসেন নাই। গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। রামদাসবাবু উপরের তলায় পিছনের বারান্দায় রান্নাদি করার পর, আমরা স্নান, আহার সম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরে শয়ন করিলাম, এই সময়ে ঠাকুর তাঁহার বিছানার উপর একখানা পাতলা সাদা চাদর গায়ে দিয়া বসিয়াছিলেন। সামান্য কালের মধ্যেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া দেখি ঠাকুর তাঁহার বিছানায় নাই। আমি প্রথমতঃ ভাবিলাম, হয়ত কোন প্রয়োজনে তিনি নীচে গিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে-ও তিনি ফিরিয়া না আসায়, উভয় বারান্দায় যাইয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়াও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, আবার আসিয়া শয়ন করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যে, মুজাঃফরপুরে ১৩ দিন থাকা কালে, এক ভোর সময় ছাড়া তাঁহাকে বাথরুমে যাইতে কি, মল-মূত্রাদি ত্যাগ করার জন্য কোথায়ও যাইতে দেখি নাই। তাহা হইলে তিনি গেলেন কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিয়া দেখি আমি প্রথমবার ঘুমাইবার সময় তাঁহাকে যে ভাবে

উপাবিষ্ট দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই তিনি রহিয়াছেন। আমার জানিতে কৌতুহল হইল—ঠাকুর কোথায় গিয়াছিলেন? কারণ প্রাতে বেড়াইবার সময় আমাদের সঙ্গে বহু লোকের দেখা হইলেও তাহার মধ্যে একজন বাঙ্গালীরও দেখা পাই নাই। তাহা ছাড়া ঠাকুর নিজেই বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে তিনি আর কখনও আসেন নাই। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তথায় কাহারও বাড়ীতে যান নাই। মুজঃফর-পুরের বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর অশরীরীভাবে বৃন্দাবনাদি নানাস্থানে বেড়াইয়া আসেন, তবে কি ঠাকুর কিছুকালের জন্য ঐরূপ কোন স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন? মনে মনে ঐরূপ অনেক চিন্তাই করিলাম, কিন্তু ঠাকুরকে ঐসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। রামদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি উপর তালা হইতে নীচে নামার সিঁড়ির নিকটেই একস্থানে দ্বিপ্রহরে শুইয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরকে কোন সময় নীচে নামিতে দেখেন নাই। আমার মনে নানা জল্পনা-কল্পনা হইতে লাগিল। শুনিয়াছিলাম, সাধু মহাত্মাদের মধ্যে কেহ কেহ দেহ একস্থানে রাখিয়া বহুদূরে নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া পুনঃ দেহে প্রবেশ করেন। কিন্তু দেহ ও কাপড়, চাদর-আদিসহ আকাশপথে যাওয়ার কথা কখনও শুনি নাই।

তারপরদিন প্রাতে রামদাসবাবু-সহ আমাদের তাঁহার কাশীর বাসা বাড়ীতে যাওয়ার কথা। ভোরে উঠিয়াই রামদাসবাবু রান্নার আয়োজন করিলেন। আমিও স্নানাদি শেষ করিয়া তাঁহার রান্না করার সময় কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের থাকার ঘরে আসিয়া দেখি ঠাকুর সেখানে নাই। এদিক ওদিক

ঘুরিয়া কোথাও তাঁহাকে না দেখিয়া আবার রামদাসবাবুর নিকট গিয়া বসিলাম এবং ঠাকুর কোথায় গেলেন এবং কেনই বা দেরী করিতেছেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ কোথাও যাইতে হইলে, ট্রেন ছাড়ার সময়ের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পৌঁছানোর অভ্যাস সম্বন্ধে জানা ছিল বলিয়া, সেদিন যেন তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে বোধ করিয়া আমরা উভয়েই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলাম। পূর্ব্বদিন দ্বিপ্রহরের অভিজ্ঞতা প্রসূত কৌতূহলহেতু ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠেন কিনা, দেখার জন্য আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আমাদের উভয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ব্যস্ত সমস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"আপনারা খান নাই ?" আমরা বলিলাম, "রান্না হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি না আসায় আমরা খাইতে বসি নাই"। ঠাকুর তখন হাত পা না ধুইয়াই বসিয়া পড়িলেন। আমরা উভয়ে একটু প্রসাদ লইয়া তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিলাম এবং জিনিষপত্র টাঙ্গাতে উঠাইয়া ষ্টেশনে পউস্থিত হইলাম, তখনও ট্রেন আসার ১০।১২ মিনিট দেরী ছিল। প্রায় সন্ধ্যার সময় কাশীতে পৌঁছিয়া, একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা রামদাস বাবুর তথাকার বাসার দিকে রওনা হইলাম। গাড়ী একটু অগ্রসর হইতেই আমার মনে হইল, ঠাকুর যেন অশরীরী কাহাকেও মাথা একটু নোয়াইয়া নমস্কার কি প্রতিনমস্কার করিলেন। ইহার পর মনের মধ্যে যে কৌতুহল প্রায় দুইদিন অতিকষ্টে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা নিবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা, মানুষ

কি নিজ শরীর ও পরিহিত বস্ত্রাদি সহ শূন্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে পারে? "ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ যাইতে পারে, মানুষ ঐ সকল নিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে পারে এবং একই সময়ে বহুস্থানে উপস্থিত হইতে পারে।" আমি তখন বলিলাম, "আপনি কাল বিকালে কোথায় গিয়াছিলেন?" ঠাকুর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—'হ্যাঁ, কাল দ্বিপ্রহরে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলাম।" আমি আবার বলিলাম, "আজ প্রাতে কোথায় গিয়াছিলেন?" তখনও ঐ ভাবেই বলিলেন, "আজ প্রাতেও একটু বেড়াইতে গিয়াছিলাম।" ইহার পর আর প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হইল না।

## শোকে সান্ত্বনা

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে অসংখ্য লোককে গভীর শোকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়া শোকের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের পরিবারের দুইটি অত্যন্ত শোকাবহ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে আমাদিগকে কল্পনাতীত শান্তি দিয়াছেন তাহা বিস্তারিত ভাবে আমার প্রণীত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছি। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলিয়া এই পুস্তকের পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসুধাময় দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ননীর ১৩ বৎসর বয়সে একটি উচ্চ শিক্ষিত ও অতি মধুর চরিত্রাবিশিষ্ট

যুবকের সহিত বিবাহ হয়। ছেলেটি কলিকাতায় সেক্রেটারিয়েটে কাজ পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের দুই বৎসর পরেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নানাপ্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও প্রায় একবৎসর ঐরূপে ভুগিয়া একদিন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় কলিকাতায় দেহত্যাগ করে। ঐদিন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় আমি টেলিগ্রাম পাইলাম যে "সতীশ" (আমাদের জামাতা) আর ইহজগতে নাই। এই নিদারুণ সংবাদে আমি অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং প্রথমেই আমার মনে হইল এই সংবাদে আমার দাদার অবস্থা কি হইবে? কারণ তিনি স্বভাবতঃই অতীব শান্ত প্রকৃতির এবং কোমল হৃদয়বিশিষ্ট। আমার তখন মনে হইতে লাগিল, 'ঠাকুর, তোমাকেত' ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও আমাদের নিকটে আসিতে প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু তুমি অবিলম্বে আমার দাদার নিকট উপস্থিত হও ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। দাদার মেয়েটি তখন তাঁহার নিকটেই ছিল। পরদিন প্রাতে আমি তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলে সকলেই ভীষণ শোকাবেগে অস্থির হইয়া কান্নাকাটি করিলাম। একটু পরেই শুনিতে পাইলাম যে ঠাকুর আমি পৌঁছানোর পূর্ব্বদিন প্রাতে অর্থাৎ সতীশের মৃত্যুর সমসাময়িক কালে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংই দাদার বন্ধু শ্রীঅক্ষয় কুমার বসুর নিকট প্রেরিত ঐ শোকাবাহ টেলিগ্রামের সংবাদ দাদাকে জানাইয়াছেন।

তৎপূর্ব্বে বহুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর কোথায় আছেন তাহা আমরা কিংবা ঐ জামাতা, বা, কলিকাতায় শুশ্রূষাকারী কেহই জানিত না।

ঠাকুর হঠাৎ ঐদিন চট্টগ্রাম আসিয়া স্বয়ং ঐ নিদারুণ সংবাদ দাদাকে দিলে তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান হইলে দেখিলেন যে তিনি ঠাকুরের কোলেই শুইয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত পরিবারস্থ সকলকে সান্ত্বনা দিয়াছেন জানিয়া আমি কিছুটা আশ্বস্ত হইলাম। শুনিয়াছিলাম গুরু কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট যে রূপে যাহাই প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, সেইরূপ গুরুও সমস্ত প্রার্থনাই পূরণ করেন। কিন্তু আমাদের গুরু এমনই দয়াল যে তিনি প্রার্থনার প্রতীক্ষা রাখেন না, প্রার্থনার পূর্ব্বেই তাহা পূরণ করেন। আমি পূর্ব্বদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় আকুলচিত্তে দাদার নিকট তাঁহার অবিলম্বে উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি ঐ সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া দাদাকে সান্ত্বনা দিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি দাদার বাসায় পৌঁছানোর দিনও বিকালবেলা চট্টগ্রাম শহর হইতে চট্টগ্রাম বন্দরের জেঠিতে দাদার বাসায় তিনি আসিয়াছিলেন। তৎপরদিন আমরা সকলেই একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরসহ নোয়াখালীর বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তথায় প্রায় এক সপ্তাহ থাকিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ শান্ত করিয়া তিনি নোয়াখালী ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতি (খুকু) কে আমরা যথাসাধ্য খরচ করিয়া একটি সুপাত্রে বিবাহ দিয়াছিলাম। ঐ সম্বন্ধ স্থির করার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতিদানকালে 'উহারা সুখীই হইবে' ইহা বলিয়াছিলেন। এ আশ্বাসে পরমানন্দে উহাদের বিবাহ নোয়াখালীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরেই মেয়েটি টাইফয়েড রোগে ভাগলপুরে তাহার

শ্বশুরালয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি তাহার অতি সঙ্কটাপন্ন অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া নোয়াখালী হইতে ভাগলপুরে প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, মেয়ের অজ্ঞান অবস্থা, কথা বলিতে পারেনা। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বলিলেন প্রায় দুইদিন যাবৎ তাহার ঐ অবস্থা চলিতেছে এবং তথাকার সুদক্ষ সিভিল সার্জেন ও আরও কয়েকজন ভাল ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "খুকু, খুকু, আমি বাবা—কোন ভয় নাই, এই কথা বলিতেই সে 'উঁ' 'উঁ' করিয়া উঠিল। তাহাতে আমার মনে হইল তাহার জ্ঞান আছে। আমি তখন জোরে বলিলাম, ঠাকুর যে নাম দিয়াছেন তাহা কি তোর মনে আছে?" সে মাথা নাড়াইয়া জানাইল যে, তাহার তাহা মনে নাই। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে বার বার তাহার কানে 'রাম রাম' কয়েকবার উচ্চারণ করিলাম, ক্রমে আমার মনের ভ্রান্তিতে বা সত্যই মনে হইল যে তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে যাইতেছে। কিন্তু বিকাল বেলা হইতে আবার অবস্থা একটু খারাপের দিকে যাইতেছে বলিয়া সকলেই মনে করিতেছিল এবং স্থানীয় সিভিল সার্জেনও এমন ভাব দেখাইলেন যে সন্ধ্যার সময়ই তাহার দেহত্যাগ হইবে। আমি অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে কেবল নাম জপিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময় তাহার সমবয়স্ক মেয়েরা, যাহারা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের এবং উপস্থিত সকলকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাঁহারা যেন সকলে যাঁর যাঁর গুরুনাম, উপাস্য দেবতার নাম জপ করেন, ইহাই অনুরোধ করিলাম। ক্রমে আবার তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে যাইতেছে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন, আমার নেহাৎ

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথাকার আত্মীয়দের পীড়াপীড়িতে যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া আবার তাহার নিকটে আসিয়া বসিলাম। প্রায় রাত্রি বারোটার সময় তাহার শ্বশুর শাশুড়ী পাশের কাম্‌রায় একটু বিশ্রাম করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে আমি তথায় বোধ হয় আধ ঘণ্টাও শুই নাই, এমন সময় আমার জামাতা আসিয়া বলিল, 'বাবা দেখুন খুকু কি ক'রছে!' আমি যাইয়া দেখি সে খুব জোরে শ্বাস টানিতেছে এবং সম্ভবতঃ এই শেষ কাল উপস্থিত মনে করিয়া তাহার হাতখানা আমার এক হাতের মধ্যে রাখিয়া অপর হাত মাথায়, ঠাকুর আমাকে যে নাম দিয়াছিলেন তাহাই জপ করিতে করিতে বুলাইতে লাগিলাম, ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং উভয় চক্ষুই একটু বিস্ফারিত হইল। তাহার অন্যপার্শ্বে উপবিষ্ট নার্স টি তাহার চক্ষু বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আমি নিষেধ করিলাম। তৎপর আপনা হইতেই তাহা সাধারণ অবস্থায় আসিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হইল।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পনের ষোল ঘণ্টা আমি তাহার নিকটে থাকিয়া যথাসাধ্য নামজপ করিতেছিলাম, ঐ সময়ের মধ্যে কখনও ঠাকুর আমার মনে এই প্রার্থনা উদয় করেন নাই যে, তিনি যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেন। বরং ইহাই আমার বারবার মনে হইতেছিল যে,—'ঠাকুর যাহা তুমি তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক মনে কর, তাহাই কর।'

যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে তখন-ই হঠাৎ আমার শোকোচ্ছ্বাস ভীষণভাব ধারণ করিল এবং কিছুতেই আমি

তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হই নাই। তাহার অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও আমি ভাবিয়াছিলাম যে ঠাকুর যখন এক সময় বলিয়াছেন যে, তাহারা অর্থাৎ জামাই ও মেয়ে সুখী হইবে এবং তখনও তাহাদের ঐ প্রকার কোনও সুখের অবস্থা দেখিতে পাই নাই, তখন তাহার এবার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার মৃত্যুর পর আমার মনে হইল— তাহা হইলে কি ঠাকুরের কথা মিথ্যা হইল? তাহা হইলে কোথায় দাঁড়াইব? আমার জীবনের শান্তির ও সর্ব্বাবস্থায় প্রধান সম্বল, ঠাকুরের প্রতিই যদি অবিশ্বাস হয় তবে কোথায় দাঁড়াইব? এইরূপ চিন্তাই বারবার মনে আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যদিও আমি মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলি নাই, আমার অতি অসহায় অবস্থা বুঝিয়া আমার বৈবাহিক মহাশয় নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতেছিল, ঐ সময়েই এই পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ পিতা কন্যা হারাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহাতে তাহারা ত' জীবনের সর্ব্বস্ব হারায় নাই। যাহা হউক সমস্ত রাত্র তাহাকে স্পর্শ করিয়া এবং যথাসাধ্য ঠাকুরের প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র জপিয়া কাটাইলাম। ভোর হইলে বহু লোকসমাগম হইল এবং তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিবে জানিয়া আমি ঐ কামরা পরিত্যাগ করিলাম। আমার আত্মীয় শ্রীমান মাখনলাল রায় চৌধুরী (তৎকালে ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক) আমাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ ঠাকুর সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব কথাগুলিই ভাবিতে লাগিলাম। ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে তাহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্নানাদি করিয়া আমরা আমার বৈবাহিকের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলে আমি পুনরায় অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। তাঁহারা আমাকে একটি বিছানায়

শোয়াইয়া দুইটি টেবিল ফ্যানের বাতাস যেন আমার মাথায় লাগে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। একটু পরে আমার জামাতা আসিয়া আমার পাশে বসিল। ছেলেটি অতি সরল প্রকৃতির। সে আমারই মত অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাবা, কত লোকেরই ত' অল্প বয়সে পত্নীবিয়োগ হয় তাহাতে খুব অস্থির হওয়ার কোন কারণ নাই, কিন্তু আমি এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, সে অবস্থায় জগতে বোধহয় কেহই পড়েনা। কারণ আমার জীবনের প্রধান সম্বল শ্রীশ্রীঠাকুকের উপরে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা উভয়ে জীবনে সুখীই হইবে। কিন্তু তাহা হইল কই? বিবাহের পর এই দুই বৎসরের মধ্যে বোধ হয় খুকু ছয় মাসেরও বেশী আমাদের বাড়ীতে ছিল। বাকী সময়েও সে ভাগলপুরে থাকিত, আর তুমি পূর্নিয়ায় থাকিয়া কাজ করিতে। তোমরা কি করিয়া সুখী হইলে? এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "বাবা, আমরা ত' সুখেই ছিলাম। এখান হইতে পূর্নিয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। প্রতি বন্ধে এবং শনি, রবিবার আমি ভাগলপুরে আসিতাম।" আমার জানা ছিল যে ছেলে মেয়ে উভয়েই পূর্নিয়াতে একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সকল কারণে জামাতার এই কথাতেও আমার মন শান্ত হইল না। ঐ সময় ঠাকুর কলিকাতায় কতকটা লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তথায় যে প্রকারে হউক আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কেন তাঁহার কথার ব্যতিক্রম হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিব স্থির করিলাম। উপরোক্ত কারণে আমি ঐ রাত্রেই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম। ষ্টেশনে শ্রীমান মাখন

আমাকে লয়া আসিবার সময়, এক প্রকার খালি গায়ে ও খালি পায়েই আমার জামাতা ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে আসিয়া ট্রেণ ছাড়া পর্য্যন্ত ঐ কামরায় দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ রাত্রে যদিও আমি উপরের বাঙ্কে নিরুপদ্রবে শুইয়াছিলাম, তত্রাচ ঠাকুরের কথার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা চিন্তা করিয়াই আর ঘুমাইতে পারি নাই। মনে মনে স্থির করিলাম যে, হাওড়া ষ্টেশনে আমার ছেলে মেয়েরা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে কিছুতেই আমার এই শোকাচ্ছন্ন ভাব বুঝিতে দিব না।

কিন্তু তাহারা হাওড়া ষ্টেশনে আমার কামরার সম্মুখে আসিলে আমি 'হাউ' 'হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং কিছুতেই সেই শোকের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঐ অবস্থায় অতিকষ্টে আমার আত্মীয় শ্রীমান অরুণচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম এবং যাহাতে আমি কলিকাতায় নানা স্থানে ঘুরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে এক খানা মোটরগাড়ী সমস্ত দিনের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তিনি কলিকাতায় যেখানে যেখানে থাকিতেন তাহা আমার জানা থাকায় আমি দ্বিপ্রহরের পরই প্রথমতঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের নিকটস্থ ১৬ নং কালু ঘোষ লেনে ৺নির্ম্মল সেন মহাশয়ের বাড়ীতে, তৎপর বেলেঘাটা ১১ নং তালপুকুরে ডাঃ কৈলাশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে ও পরে রুস্তমজী ষ্ট্রীটে পূর্ণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত জানিলাম যে, ঠাকুর গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন ঘোষের পরাশর রোডের বাড়ীর তেতলা কামরায় আছেন। ঐসময় তিনি নেহাৎ শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি ছাড়া প্রায় কাহাকেও দেখা

দিতেন না। ধীরেনবাবুর বাড়ীর ঐ কামরায়ও আমি সরাসরি চলিয়া গিয়াছিলাম এবং যাইয়া শুনিলাম যে, তিনি ঐ দিন ১৭/১৮ বার পায়খানায় গিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায় আছেন। পরপর্ত্তী দিন প্রাতেই আমাকে নোয়াখালী রওনা হইতে হইবে। কাজেই ঐ কথা শুনা সত্ত্বেও আমি ঐ কামরায় প্রবেশ করিলাম। ঠিক এই সময়ে ঠাকুর বলিলেন, "উঃ, বড় বেদনা," এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পায়খানায় গেলেন। ঠাকুরের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু বলিব কিনা এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার আর কলিকাতা অপেক্ষা করার সাধ্য ছিলনা বলিয়া, তখনই তাঁহাকে সকল কথা বলিব বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময়ে তথায় উপবিষ্ট আমাদের পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের তৎকালীন মোহন্ত মহারাজ ও আরেকজন ব্যক্তিকে অল্প সময়ের জন্য ঐ কামরা হইতে আমি বাহির হইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা বাহিরে গিয়া বসিলেন। আমি তখন এক রকম কৈফিয়ৎ তলবের ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার বড় মেয়ে, খুকু মারা গিয়াছে, জানেন ত'?" ঠাকুর তদুত্তরে "মারা গিয়াছে" ও আরও কি সামান্য কথা একটু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বলিলাম, "বেদবাণী হইতেও আমি আপনার কথা বেশী বিশ্বাস করি, তাহা জানেন ত'? আপনি বলিয়াছিলেন যে, জামাই ও মেয়ে সুখী হইবে। কিন্তু তাহারা সুখী হইল কই?" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তাহারা সুখেই ত' ছিল।" আমি বলিলাম, 'না, তাহারা দুঃখেও ছিল।' ঠাকুর তৎপর আমাকে কতগুলি কথা বলিলেন, যাহা এখন আমার মনে নাই। তাহাতে একটু সুস্থ হইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুকু এখন কোন স্থানে আছে।"

আমার এই কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল। আমি জানিতাম যে, তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তেরা খুব নিভৃত অবস্থায় পরোলকগত আত্মা কোন্ লোকে কি অবস্থায় আছে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা বলিয়া দিতেন এবং কাহারও কাহারও সম্পর্কে খুব ভাল অবস্থায় আছেন, আবার কাহারও কাহারও সম্বন্ধে খারাপ অবস্থায় আছেন বলিয়া উল্লেখ করিতে আমি নিজেও শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "সে খুব আনন্দেই আছে। আপনার কোন সন্তান অস্থানে যাইবেনা।"—ইত্যাদি। ঐ সময় হইতে আমার শোকের অবস্থা যেন সম্পূর্ণ চলিয়া গেল।

বস্তুতঃপক্ষে নোয়াখালীর বাসাবাটীতে পোঁছিয়া নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইলে, তাহাদের শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়াও আমি শোকবিহ্বল হই নাই। ইহাতে কেহ কেহ আমার তৎকালীন স্থৈর্য্যের প্রশংসা করিলেও ঐ স্থিরতা বা ধৈর্য্য যে সম্পূর্ণই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা সম্ভূত তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। আমি স্বভাবতঃই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, অতি সহজেই দুঃখে ও আনন্দে বিহ্বল হই। সুতরাং যদি পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ শান্তির ব্যবস্থা না করিতেন, ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে স্থির থাকা একেবারেই অসম্ভব হইত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সশরীরে একই সময় বহুদূর বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকা সম্পর্কে বহু কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বেদবাণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমি অতি

নির্ভরযোগ্য কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। বেদবাণী সংকলনকারী ইন্দুবাবুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা দুইটি :—

(১) ইন্দুবাবু যখন বিডন্ স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন, ঐ সময় একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পাঁচবৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র পণ্টু হারাইয়া যায়। তৎপূর্ব্বদিন মাত্র সে তাহার মায়ের সঙ্গে প্রথম কলিকাতা আসিয়াছিল। সুতরাং রাস্তাঘাট কিছুই তাহার জানা ছিল না। বাড়ীর সকলেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও ছেলের কোন খবর পাওয়া গেল না। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময় তাঁহার ভক্ত মতিলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ডিক্সন লেনের বাসাতে ছিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রে তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, একটু জানাজানি হইলেই ছেলের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া ঐ রাত্রেই নানাপত্রিকায় পরের দিন বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য ব্যবস্থা করা হইল। এদিকে সেই রাত্রেই এক ভদ্রলোক রাস্তায় এই শিশুটিকে দেখিতে পান এবং তথায় নানাজনের প্রশ্নের উত্তরে সে পথ হারাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে বুঝিয়া তাহাকে নিকটস্থ মুচিপাড়া থানায় জমা দিয়া দেন। পরের দিন ফরওয়ার্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভদ্রলোকটি ইন্দুবাবুর গৃহে সংবাদ পাঠান এবং হারানো শিশুকে বাড়ীতে নিয়া আসা হয়।

তাহাকে বাড়ীতে নিয়া আসিলে তাহার মা তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় বড় রাস্তা পার হইয়া এতটা পথ একা চলিয়া গেলি, তোর ভয় হইল না?" উত্তরে ছেলে বলিল, "ভয় হইবে কেন? ঠাকুর যে আগাগোড়াই সঙ্গে সঙ্গে

ছিলেন এবং বড় রাস্তাগুলি হাতে ধরিয়া পার করাইয়া দিয়াছেন। রাস্তায় ভদ্রলোকেরা যখন আমাকে ঘিরিয়া নানারকম প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই ঠাকুরকে আর দেখি নাই।" যতবার জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ এক কথাই সে বলিল। পাঁচ বৎসরের বালক যে বানাইয়া এমন একটা কথা বলিয়াছে, ইহা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে ঠাকুর বালকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং ভদ্রলোকেরা আসিয়া পড়ার পর যখন দেখিয়াছেন যে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই, তখনই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। পরে জানা গিয়াছে যে, ঐ সময় ঠাকুর ডিক্সন লেনের মতিবাবুর বাসাতেই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

(২) একদিন বিকালবেলা ইন্দুবাবু তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু প্রভাতবাবুর বাড়ীতে যাইয়া দেখেন যে, তিনি এবং তাঁহাদের অপর একজন বন্ধু অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাস করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রভাতবাবুর একটি কন্যা, একটি পুত্র ও একজন ভাগিনেয়ের বসন্ত হইয়াছে। ইহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহারা তিনজনেই দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর খালি পায়ে একখানা চাদর গায়ে, অবনত মস্তকে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতরের একঘরে প্রভাতবাবুর স্ত্রী রোগী তিনটির পরিচর্য্যায় রত ছিলেন। ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতরে যাইতে দেখিয়া ইন্দুবাবুরা তিনজনেই বৈঠকখানার বাহিরে আসিলেন। কিন্তু ভিতরের বারান্দায় গিয়া ঠাকুরকে আর দেখিতে পাইলেন না। প্রভাত

বাবুর স্ত্রী ঐ সময় ঘরের দরজায় একখানা আসন হাতে লইয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি, 'ঠাকুর কোথায় গেলেন' বলিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রভাতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, ঠাকুর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া তিনি তাকের উপর হইতে আসনখানা আনিবার জন্য উঠিয়াছিলেন, ফিরিয়া দেখেন ঠাকুর নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, দরজার বরাবর উল্টাদিকের দেওয়ালে যে আয়না ঝোলান ছিল তাহাতেই প্রথম তিনি ঠাকুরের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। সকলে মিলিয়া ঠাকুরের খোঁজ করিয়াও কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। বসন্ত রোগাক্রান্ত প্রভাতবাবুর ভাগিনেয়টিও ঠাকুরকে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। একই সময়ে পাঁচজন লোকেরই যে দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল তাহা কিছুতেই মনে করা যায়না।

প্রভাতবাবুর স্ত্রী পরে প্রকাশ করিলেন যে, তিনজনের একসঙ্গে বসন্ত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আর্ত্ত হইয়া ঠাকুরকে ঐকান্তিকভাবে স্মরণ করিতেছিলেন। দু,তিন দিনের মধ্যেই রোগীদের বসন্তের গুটিগুলি মিলাইয়া গেল; পাকিলওনা, বেদনাদি কোন উপসর্গও আসিল না। ভক্তবৎসল ঠাকুর তাহাদিগের রোগমুক্তির জন্যই হঠাৎ এইভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘটনার দিন হরিদ্বারে ছিলেন। তথায় পত্র দিয়া জানা গিয়াছে যে, উল্লিখিত দিনে ও সময়ে হরিদ্বারে কোন কোন ভক্ত তাঁহার নিকটেই বসিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেদিনকার আবির্ভাবের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "এ রকম ত' হয়ই।" ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকারের ঘটনা আরও অনেক শোনা যায়। মাত্র আর দুইটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিব।

এক বৎসর রাম নবমীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভদ্রলোক ঐ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করেন। অবসরপ্রাপ্ত ইনকানট্যাক্স কর্মিশনার শ্রীধুক্ত মনীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেক ভক্তই সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন প্রাতঃকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় চাদর-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত দিন ঐভাবেই কাটাইয়া সন্ধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ধ্যার পর মনীন্দ্রবাবু ঐ বাড়ীতে গেলে গৃহকর্ত্তার অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্তদিন ঐভাবে কেন ছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সব জায়গাতেই ত' দেখিতে হয়।

"এই ঘটনার দুই তিন দিন পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত দীনেশ চন্দ্র বসু তাঁহার পিতা শ্রীকান্ত বসুর নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়া তাহা মনীন্দ্রবাবুকে দেখান ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, বিগত রাম নবমীর উৎসব বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব দিবসে বেলা আনুমানিক ১১টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তিনি তিন চার ঘণ্টাকাল সেখানে (ঢাকা জিলার বাহেরক গ্রামে) অবস্থান করেন। অপরাহ্নে তাঁহারা

শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতায় যাওয়ার জন্য বহর ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে তুলিয়া দেন। ঠাকুরের পৌঁছ সংবাদ জানাইবার জন্যই তিনি ঐ পত্র দিয়াছিলেন।

একদিন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে হঠাৎ একটা খবর পাইয়া তাঁহার দুই ভ্রাতার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী রওনা হন। পথে বউবাজার ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতেই তিনি দেখিলেন যে, ঠাকুর একদিকে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল দু' একটি কথার পর হঠাৎ ঠাকুর ডাক্তারদা'কে বলিলেন, "দুর্য্যোধনরা একশ' ভাই ছিল। লোক কেহই ভাল ছিলনা, তথাপী নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়া করিত না।" ঠাকুরের এই কথা শুনা মাত্র ডাক্তারদা'র ভাইদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার সংকল্প একেবারে শিথিল হইয়া গেল।

ডাক্তার দা' মনে করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে ডীক্সন্ লেনে মতিবাবুর বাসায় রাখিয়া একটু কাজ সারিয়া পুনঃ ঠাকুরের কাছে আসিবেন।

তাঁহারা মতিবাবুর বাসায় পোঁছিলে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঠাকুরকে পাইয়া মতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন

এবং ঠাকুরকে দোতলার একখানি ঘরে আনিয়া বসাইলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাক্তার দা' ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত ব্যগ্রভাবে উপরে নীচে ঠাকুরকে খোঁজা খুঁজি করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না।

ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন। এবং ঠাকুর ঐ তারিখে সিমলাতে সত্যেন্দ্রবাবুর বাসায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্পর্কে পরে সত্যেন্দ্রবাবু ও ডাক্তার দা'র মধ্যে আলোচনা হইয়া ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সশরীরে ঐদিন একই সময় কলিকাতায় ও সিমলাতে ছিলেন।

## সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব।

১৩৩৮ বাং সনের বড়দিনের বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদপুর থাকাকালে আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকে যাওয়ায় কথা উত্থাপন করিলে তিনি মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া সমবেতভাবে জন্মোৎসব করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী ঐ সময় উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীর নিকটস্থ লালমোহন সাহা, চণ্ডী চরণ পাল আদি কয়েক জনের সাহায্য লইয়া ঐ কাজ সম্পন্ন করিতে তিনি বলিয়াছিলেন। তদনুযায়ী নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর আদি স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া আমরা চাঁদপুর হইতে লঞ্চে ডিঙ্গামানিক গ্রামে গেলাম। লঞ্চ কার্ত্তিকপুর ষ্টেশনে

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই চিত্রপট তাঁহার সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত জন্মোৎসবে গত ২৭ বৎসর যাবত পূজিত হইতেছে।

LIBRARY
No. 9/324
[ ১৯৭ ] ...ayee Ashram
BANARAS

থামিলে স্থানীয় লোকেরা ঠাকুর আসেন নাই জানিয়া মনে মনে একটু দুঃখিত হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা যে বর্ণাতীত প্রীতি ও সৌজন্যের সহিত আনন্দোৎফুল্লভাবে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেতভাবে ঐ বৎসরের জন্মোৎসবে যোগদানকারী ভক্তমাত্রই এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ঐ মহোৎসবে প্রসাদ পাইয়াছিল। যাহারা কখনও কীর্ত্তনে নৃত্য করে নাই, আমাদের ন্যায় সেইরূপ বহুলোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে নৃত্য করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল। এই সম্পর্কে আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত ও গুরুভাই ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। সেইরূপ আনন্দ জীবনে কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঠাকুরবাড়ীর লোকের সহৃদয়তা, লৌকিকতা ও স্নেহ আমাদিগকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই উৎসব আনন্দের কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ অবর্ণনীয় আনন্দ, নৃত্য, কীর্ত্তনাদির কথা আমি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, স্বয়ং মহাদেব ঐ কীর্ত্তন আনন্দের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং মা অন্নপূর্ণা ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৩৩৯ সনেও ডিঙ্গামাণিকে সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে আমরা সপরিবারে বন্ধু শৈলেনের কীর্ত্তনের

দলসহ নদীর তীর হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ বৎসরও কীর্ত্তনাদিতে ও ঠাকুরবাড়ীর স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই অনন্য সাধারণ সৌজন্যে আমরা প্রভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু যে কারণেই হউক, মহোৎসবে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা লোক সংখ্যা অনেক কম দেখা গিয়াছিল।

১৩৪০ সনের বড়দিনের বন্ধের পূর্ব্বেই আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে, সেই বৎসরও সমবেতভাবে জন্মোৎসব ডিঙ্গামাণিকে হইবে বলিয়া ময়নামতী সার্ভে স্কুলের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর নামে পত্র ছাপান হইয়া যথাসম্ভব সকল স্থানের ভক্তগণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। বড়দিনের বন্ধে আমি, পূর্ণ গাঙ্গুলি মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী তরলা দেবী কাশীতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ একটি বাড়ীতে বাস করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তেতলার একটি কামরায় থাকিতেন এবং আমরা দোতলায় থাকিতাম। একদিন প্রাতে পূর্ণবাবু তেতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "শুভদা খুব একটা ভাল খবর! শ্রীশ্রীঠাকুর এইমাত্র বলিলেন যে, এবার ভক্তদের সমবেতভাবে জন্মোৎসব হয় নোয়াখালী, না হয় ফেণীতে হইবে— ডিঙ্গামাণিকে এইবৎসর সমবেতভাবে জন্মোৎসব হইবে না।" আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এই উৎসব জন্মস্থানে না হইয়া অন্যস্থানে হইবে কেন, বুঝিলাম না।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আপনি এখনই যাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" তখন তিনি ও আমি একসঙ্গে তেতলায় ঠাকুরের নিকট গেলাম এবং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবার নাকি জন্মস্থানে জন্মোৎসব হইবে না বলিয়া

বলিয়াছেন ?" ঠাকুর তদুত্তরে, "হ্যাঁ, এবার ঐ জন্মোৎসব হয়, নোয়াখালী"—বলিয়া বোধ হয় একটু থামিলেন অথবা 'হয় নোয়াখালী' বলিতেই পাছে তিনি 'নয় ফেণীতে' বলিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম, "যদি নোয়াখালী হইতে হয় তবে নোয়াখালীতেই হইবে। কিন্তু জন্মস্থানে জন্মোৎসব না হইলে মহেন্দ্র দাদা ( ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ) আদি ত' অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন।" ঠাকুর বলিলেন, "তাহারা দুঃখিত হইবে কেন ? তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর নিজেরা যে ভাবে করিত সেই ভাবেই জন্মোৎসব করিবে। কিন্তু সকল স্থানের ভক্তগণের জন্মোৎসব এবার নোয়াখালীতেই হইবে।" আমি তথাপি একটু ক্ষীণ স্বরে 'জন্মস্থানে জন্মোৎসব হইবে না' বলিয়া একটু বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেই তিনি বলিলেন, "যেখানে ভেদাভেদ থাকে সেখানে মহোৎসব হইতে পারে না।" আমি বলিলাম, "আমি ত' সেখানে কোন ভেদাভেদ দেখি নাই!" তাহাতে তিনি বলিলেন, "না ভেদাভেদ ছিল। দেখিয়াছেন ত' প্রথম বৎসর লোকে যেখানে সেখানে বসিয়া পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু গতবৎসর সেইরূপ হয় নাই।" যতদূর মনে পড়ে, আমি রাজেন্দার নামে পত্র ছাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া বলিতেই ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "আমি রাজেন্দা টাজেন্দা বুঝি না," এই কথায় আমি আর ঐ সম্বন্ধে কোন দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলাম না। বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি ঢাকায় সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ( বর্ত্তমানে পরলোকগত ), ফেণীতে প্রথম দাদাকে, চট্টগ্রামের বিধুবাবু ও যোগেশবাবুকে ঐ মর্ম্মে পত্র দিয়া জানাইবেন।" তিনি প্রত্যেক নাম

উচ্চারণ করিতেই, পত্র দিবেন বলিয়া আমাকে জানাইলেন। আমার বারবারই মনে হইতেছিল, এই ব্যাপারে মহেন্দ্র দাদা আদি ঠাকুর বাড়ীর সমস্ত লোক আমাকে কি মনে করিবেন। তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, পূজায় ও বড়দিনের বন্ধে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেই থাকি। এমতাবস্থায় তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে হয়ত তাঁহাদের অত আদর আপ্যায়ন সত্ত্বেও আমার দ্বারাই এই বিরাট জন্মোৎসব নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত হইল। যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার উপর তৎপূর্ব্বে কোন দিনই কোন কথা বলি নাই, তৎসত্ত্বেও যেটুকু বলিয়াছি, তদধিক বলা সম্ভব নহে বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলাম। ইহার দুই একদিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

নোয়াখালীতে প্রথম বৎসর জন্মোৎসবে আমাদের নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং সময় সময় নিজকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর পরিনামে উৎসবে যোগদানকারী ভক্তমাত্রকেই বিমল আনন্দে আপ্লুত করিয়াছিলেন। নেহাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজকে অসহায় মনে করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে উন্মুখ হইলে তিনি সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং আমাদের নিজ চেষ্টায় বিশেষ কিছু করা যায় না ইহার একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঐ উৎসবে আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ঐ সকল বিবরণ আমার প্রণীত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে নামক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার পুণরাবৃত্তি করিলাম না।

এই উৎসবের আরম্ভেই একটি অল্প বয়স্ক অবাঙ্গালী যুবক আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আকারে ইঙ্গিতে ছাড়া সে কাহারো সঙ্গে কোন কথাই বলে নাই। তাহাকে কখনও আহারের জন্য কাহাকেও কিছু বলিতে, কি কোন বিষয়ে কাহারো সহিত আলাপ করিতে দেখি নাই। এই সকল নানা কারণে আমার মনে স্বতঃই এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি কোন শরীরী বা অশরীরী মহাত্মা হইবেন। আমরা তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। মহোৎসবের পর দিন হইতে আর তাঁহাকে আমরা কেহই দেখি নাই।

নোয়াখালী শহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ষোল বৎসর মাইজদিতে আট বৎসর এবং কলিকাতায় গত তিন বৎসর ( অর্থাৎ ১৩৬৪, '৬৫ ও '৬৬ বাং সনে ) এই জন্মোৎসব পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং প্রায় বৎসরই এই ভাবে কখনও ফকিরের বেসে, কখনও বা স্ত্রীলোকের বেশে এইরূপ শরীরী বা অশরীরী মহাত্মাগণ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া মহোৎসব সমাপনান্তে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে ১৩৬৪ বাং সনে জন্মোৎসবের দিন এক মহাত্মার কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে উপস্থিতির বিষয় নিম্নে বর্ণণা করিতেছি।

জন্মোৎসবের দিন যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের শ্রীপ্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যভোগের পূজাদি সমাপনান্তে প্রাতে আসন ত্যাগ করিলে, আমি নিজ মনে তথায় বসিয়া কিছুক্ষণ 'বেদবাণী' পাঠ করিয়াছি। পাঠ শেষ করিয়া পিছন দিকে ফিরিতেই দেখি যে মাথায় খুব ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, গায়ে কম্বল জড়ান একজন সাধু ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই একটু অনন্য সাধারণ

ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল। তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে তিনি কাশী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার গুরু 'মাধব পাগলা' তাঁহাকে এই জন্মোৎসব দেখিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন "গত মাঘী পঞ্চমী তিথিতে আমার গুরু আমাকে এক নাম দিতে চেয়েছিলেন"—ঠাকুরের চিত্রপটের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ঠাকুর আমাকে অন্য নাম দিতে বলায় আমার গুরুদেব আমাকে সেই নামই দিয়েছেন।" তাঁহার গুরু কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাশীতে 'পাতালেশ্বরে' বাস করেন বলিয়া বলিলেন। তাঁহার ঠিকানা আমাকে লিখিয়া দিতে বলায় তিনি একখানা পোষ্টকার্ডের উপরের অংশ ছিঁড়িয়া আমাকে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—'জয় মাধব'—৩২/৬৫, পাতালেশ্বর, বারাণসী ( U. P. )।

আমি যদিও অনেকবার কাশীতে গিয়াছি, পাতালেশ্বরে কখনও গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিশেষতঃ ১৩৬৪ বাং সনে নানাকারণেই জন্মোৎসবের পত্র খুব অল্পই নানাস্থানে দেওয়া হইয়াছিল এবং পাতালেশ্বরে কোন পত্র দেওয়া হয় নাই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম, সুতরাং কেমন করিয়া এই সাধু আমাদের এখানে আসিলেন ইহা ভাবিতেই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের জন্মোৎসবে মহাত্মাগণের আগমনের বিষয় মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে মহোৎসবের দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার ত' থাকার জো নেই, আমার গুরুদেব আজই দ্বিপ্রহরে আমাকে 'দাঁতন' রওনা হয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।" 'দাঁতন' কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে উহা মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত। তাঁহার গুরুদেবের

আদেশের কথা বলায় আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। তিনি দুইখানা এক টাকার নোট আমার হাতে দিয়া বলিলেন ঐ টাকা দিয়া একখানা লাল গোলাপ ফুলের মালা ও ভোগের জন্য মিষ্টি যেন কিনিয়া দিই। ঠাকুরের চিত্রপটের দিকে দেখাইয়া আবার তিনি বলিলেন, "আহা, কত জন্ম এঁর পিছনে পিছনে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই।" এই কথা বলার সময় তাঁহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে ছিল। ঐ টাকা দুইটি আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান শ্রীমান রামময়কে দিলে সে দুই টাকা মূল্যে লাল গোলাপ ফুলের মালা না পাওয়ায় যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন যে ফুলওয়ালা পূর্ব্বে ঐ মালার মূল্য পাঁচ টাকা বলিয়াছিল, সে-ই তাহাকে ডাকিয়া দুই টাকা মূল্যেই ঐ মালাটি দিয়া দিল।

উপরোক্ত সাধু জন্মোৎসবের প্রসাদ গ্রহণান্তে দ্বিপ্রহরেই দাঁতন রওনা হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সাধারণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নহেন, এবং তাঁহার উপরোক্ত বিষয়ে কোন মিথ্যা উক্তি করারও কারণ নাই। এমতাবস্থায় তিনি ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিয়া থাকিলে, "ইনিই অন্য নাম দিতে আমার গুরুদেবকে বলায়, তিনি অন্য নাম দিয়াছেন," এই কথা কখনও বলিতে পারিতেন না এবং নিজ হইতে দুই টাকাও ঐভাবে দিতেন না। এই সাধুর আবির্ভাবে আমিও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রথম বৎসর কলিকাতা উৎসবে নানা কারণেই আমি বহু বাধা ও অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে এইরূপ বিরাট উৎসবের জন্য স্থানাভাব, কর্ম্মী ও জিনিষপত্র আদি সকল কিছুরই অভাব সম্বন্ধে আমার মনে

মাঝে মাঝে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। তদুপরি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেতভাবে এই উৎসব ঐবার কলিকাতায় হইবে, না মাইজদিতে হইবে,. এই বিষয় লইয়া নানা কথাবার্ত্তা হওয়ায় আমি একটু বিব্রতও হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারই আদিষ্ট কাজে ব্রতী হইয়াছি, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা থাকায় কোন কথা বা বাধাই কলিকাতায় ঐ উৎসব সুসম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়, আমার মনের বিশ্বাস ও শক্তি হরণ করিতে পারে নাই। বস্তুতপক্ষে ক্রমে ক্রমে তিনি সমস্ত অভাব ও বাধাই তিরোহিত করিয়া পরমানন্দে উৎসব সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

নোয়াখালীতে প্রথম উৎসব শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী এই জন্মোৎসব হওয়ার পর হইতে প্রতি বৎসরই জন্মোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে কখনও মৌখিকভাবে এবং কখনও পত্র দ্বারা কোথায় এই জন্মোৎসব হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার অনুমতি লইয়া কার্য্যসূচী প্রস্তুত করা হইত। তিনি অনুমোদন করিলে, উহা ছাপাইয়া ভক্তগণকে জানাইয়া দেওয়া হইত। তাঁহার শ্রীদেহ ত্যাগের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি চৌমুহনী যাইয়া সেই বৎসর কোথায় এই জন্মোৎসব হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই হইবে।" ইহার পর হইতে আর আমি কোথায় ঐ জন্মোৎসব হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস বা ইচ্ছাও করি নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জিজ্ঞাসার কারণ ছিল এই যে, যদিও তিনি কাশীতে ১৩৪০ সনে সমবেতভাবে সকল স্থানের তাঁহার ভক্তগণের জন্মোৎসব নোয়াখালীতে হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, নোয়াখালীতেই যে এখন

হইতে প্রতিবৎসর জন্মোৎসব হইবে এমন কোন নির্দ্দেশ কখনও দেন নাই। এই মহোৎসবে যোগ দেওয়ার ও সম্পন্ন করার সৌভাগ্য তাঁহার সকল স্থানের ভক্তগণের উপরই তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এই উৎসব আমাকে একা করিতে বা আমার বাড়ীতে করিতে আমাকে কখনও নির্দ্দেশ দেন নাই। তাঁহার সকল ভক্তের সঙ্গে মিলিত হইয়াই উহা সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদবস্থায় প্রতি বৎসর ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা না করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইবে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত উক্তির পর আর তাহা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

১৩৫৬বাং সালের ১৮ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চৌমুহনীতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীদেহ ত্যাগ করেন এবং ঐ সনের শ্রাবণ মাসে আমার সমস্ত বাড়ীসহ নোয়াখালী শহরের জন্মোৎসব প্রাঙ্গণ নদীগর্ভে বিলীন হয়। নোয়াখালী শহর মাইজদিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি বাধ্য হইয়াই মাইজদিতে চলিয়া আসি।

ঐ বৎসর পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে সমবেতভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসব কোথায় হইবে এই বিষয় আলোচনা কালে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত নির্দ্দেশের বিষয় ঐ সভাতে ভক্তগণ জানিতে পারায়, সকলে একবাক্যে মাইজদিতে আমি যে বাসায় ছিলাম, সেইখানেই ঐ জন্মোৎসব হইবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঠাকুর আমাকে ঐ নির্দ্দেশ দেওয়ার সময় আমার পরম পূজনীয় দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত ছাড়া অপর কেহ ছিলেন বলিয়া স্মরণ নাই। আমাদের পক্ষে ঐ নির্দ্দেশের কথা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করা যে একটু অসুবিধাজনক, তাহা বলাই বাহুল্য,

সুতরাং ঐ নির্দ্দেশের কথাগুলি প্রায় গোপনেই ছিল। পাহাড়তলী আশ্রমে পূজা উৎসবের সভায় নানা স্থানের ভক্তগণের মধ্যে যখন তাঁহার আদিষ্ট এই জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কোথায় হইবে এই আলোচনা হয় তখন ঠাকুরের ঐ সম্পর্কে শেষ নির্দ্দেশের কথা প্রকাশ হয়। কলিকাতায় প্রথম উৎসবের পূর্ব্বে নানা জন নানা কথা বলায় আমি বাধ্য হইয়াই কাহারও কাহারও নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপরোক্ত কথাগুলির পুনরুল্লেখ করিয়াছি।

১৩৬৪ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে আমি চিরতরে ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করি। তাহার দুই, তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত ছেলে মেয়েরা ব্যবসা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাহাদের নিকট আসিয়া শেষ বয়সে বিশ্রাম নিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছিল। কিন্তু নানা কারণে আমি তখন ব্যবসা ছাড়া সঙ্গত বোধ করি নাই। ব্যবসা ছাড়ার বৎসর খানেক পূর্ব্ব হইতেই আমার আর ব্যবসা করা সঙ্গত হইবেনা বলিয়া বার বার মনে হইতেছিল। পরিশেষে ঐ ইচ্ছা এতই প্রবল হইল যে, আমি পূজার বন্ধের পর আর ব্যবসা করিব না বলিয়া সকলকে জানাইয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে, ব্যবসায়ে থাকিয়া ঠাকুর আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করা দূরে থাকুক, তাহা পালনের চেষ্টা করারও বেশী সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। অপর দিকে আমার নিকটে আমর স্ত্রী ছাড়া আত্মীয় স্বজন কাহারও থাকা সম্ভব হইতেছে না। এমনকি সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্থ হইলে তাহাদের পক্ষে পাসপোর্ট আদি লইয়া ২।৪ দিনের মধ্যে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হইবে না। ব্যবসা না করিয়া আত্মীয়-স্বজন শূন্য মাইজদি গ্রামে পড়িয়া

থাকা দৃষ্টতঃই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ছিল। এই সকল কারণে ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আদি স্থানে বেশী সময় কাটাইয়া, বৎসরে, পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে পূজা উৎসব উপলক্ষে কয়েক মাস, ও চৌমুহনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি আশ্রমে এবং সময় সময় তাঁহার জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকে কিছুদিন থাকা মনস্থ করিয়া নোয়াখালী ত্যাগ করিলাম।

আমার মাইজদি ত্যাগের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রতি বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষে সাপ্তাহিক যে সভা হইত তাহাতে স্থানীয় লোকদের জানাইয়া দিতাম যে, আমার এবং আমার দুই চারিজন বন্ধুর হয়ত বেশীদিন মাইজদিতে থাকা নানা কারণেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতিতেও যাহাতে ঠাকুরের জন্মোৎসব সাধ্যানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, এবং 'বেদবাণী'র উপদেশাবলী আলোচিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যেন সচেষ্ট হন। মাইজদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সংখ্যা খুবই কম, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও অগ্রণী হইতে না দেখিয়া আমরা একটু হতাশই হইয়াছিলাম। তাঁহারা ভবিষ্যতে এই অনন্দোৎসব হইতে বঞ্চিত হইলে বিশেষ দুঃখিত হইবেন জানা সত্ত্বেও আমার পক্ষে প্রতিকারের কোন পন্থা ছিলনা; কারণ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বেশী সময় পাহাড়তলী কৈবল্যধামে এবং কলিকাতায় থাকিব বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত আদেশানুযায়ী সকল স্থানের ভক্তগণের সম্মিলিতভাবে এই উৎসব ঐ দুই স্থানের একস্থানেই হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কোন আশ্রমেই জন্মোৎসব হওয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিলনা বলিয়াই সম্ভবতঃ

তিনি জন্মোৎসবের সময় তাঁহার সেবার জন্যও চৌমুহনী আশ্রমে কাহাকেও থাকিতে দিতেন না।

অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর এই উৎসব চৌমুহনীতে করার জন্য তথাকার কোন কোন বিশিষ্ট ভক্ত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ঠাকুরের সম্মতি পান নাই। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে উৎসবের মাসে আমার কলিকাতায় থাকিতে হইবে বলিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত নির্দ্দেশানুযায়ী এই উৎসব কলিকাতায় না হইয়া উপায়ান্তর ছিলনা। উপরোক্ত কথাগুলি বারংবার বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মাইজদি বাসীদের সান্ত্বনা দিতে পারি নাই এবং আমি তৎকালে রাহুর দশাগ্রস্থ ছিলাম বলিয়াই সম্ভবতঃ কলিকাতায়ও কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধুগণকে এই উৎসব যে তাঁহাদের ত্রাণকর্তার আবির্ভাবেরই উৎসব, আমার বাড়ীর কোন মামুলী উৎসব নহে, আমার বাড়ী ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থানমাত্র, এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারি নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা সঙ্গত যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে কয়েক বারই বলিয়াছেন যে, রাহুর দশায় বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বিসংবাদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় ঐ সময়ে যথাসম্ভব নির্জনে থাকার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

কলিকাতায় প্রথম বৎসরের জন্মোৎসবই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট তাঁহার সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত উৎসব, সেই সম্বন্ধে আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব বর্ণিত ঐ অজ্ঞাত সাধুটিকে জন্মতিথি পূজার দিন কলিকাতার জন্মোৎসব প্রাঙ্গনে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকল স্থানের তাঁহার ভক্তগণের মিলিত এই উৎসব সম্পর্কে আমাকে মাঝে মাঝে তাঁহার চিরন্তন অবর্ণনীয় মাধুর্য্যময় কৃপা লিপিতে তিনি অনেক কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু নানাকারণে আমি তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। নিম্নলিখিত দুইখানা পত্র হইতে পাঠক পাঠিকাগণ এই উৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নোয়াখালীতে এই উৎসব প্রথম বৎসর অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওঁ নমঃ শ্রীগুরু রামচন্দ্রায়।

25 Naradghat,
Benares City
3. 2. 34.

সবিনয় নিবেদনমিদং—

দাদা,

আজ কয়দিন ধরে আশা করছি আপনার পত্রে উৎসবের সবিস্তার আনন্দ সংবাদ পাইব, কিন্তু অদ্যাবধি পত্র না পাওয়ায় পত্র লিখিলাম। গত রবিবার রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যথারীতি ঔষধ দিবার সময় তিনি বলিলেন "আজ আর ঔষধ ধারণের স্থানও পেটে নাই" এবং শ্রীশ্রীঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন সমস্ত শক্তি ও সকল দেবতাকে সঙ্গে নিয়া তিনি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ ইচ্ছায় কৃপা করিয়া ভক্তিহীনের বাসায় গত ১২ই মাঘ আসিয়া

অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বদা দরজা বন্ধ থাকে তিনি ২৪ ঘণ্টা বসেই থাকেন কোন সংজ্ঞা নাই। দিনের মধ্যে কেবল প্রাতে একটু দুধ খান। শরীর শীর্ণ, রক্তহীন হইয়া গিয়াছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন জগতের মঙ্গলের জন্য নচেৎ প্রলয় সম্ভব। ইহা কাহাকেও জানাইবেন না। মাঘ মাস পর্য্যন্ত তাঁকে এইরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে। মাঘ মাস বাদে গ্রহরা সরিয়া যাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও এইরূপ জপ করিতে দেখি নাই। ... ... ... ... ... ... ... ... ... ইতি—

স্নেহের ভাই কানাই”

দ্বিতীয় পত্রখানা শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন—

Kishoreganj
13. 2. 38.

My dear Subhada,

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

আসা মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসবের খবর ও কোথা ২ হইতে কে ২ আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। “খুব ভাল কীর্ত্তন হচ্ছে না?” আমি উত্তর দিলাম। তিনি বল্‌লেন “বৈকুণ্ঠ গোলক, কৈলাসের অধিবাসীগণ ও ত্রিলোকের দেব দেবী সবই আসিয়াছেন।” প্রসাদ নিয়া আসিয়াছি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ... ... .... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

affly
Pramatha

## আশ্রম পরিকল্পনা

বাং ১৩৩৫ সনের শেষ ভাগে, অথবা ১৩৩৬ সনের প্রথম ভাগে পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী আমাকে পত্রদ্বারা জানান যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার থাকার জন্য একটি আশ্রম করার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে লিখিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি যতটা বুঝিয়াছি তাহাতে তিনি কোন আশ্রমে থাকিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি সম্ভবতঃ সারা জীবন নানা স্থানে ঘুরিয়াই কাটাইবেন। প্রমথবাবু পরের পত্রে জানাইলেন, ঠাকুর স্পষ্ট ভাবেই ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই পত্রালাপের কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি নাকি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা প্রমথ দাদাকে বলিয়াছেন ?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে ভালই হয়। এখন বয়স হইয়াছে একস্থানে বসিয়া পড়িলে মন্দ হয় না।" তাঁহার এই কথার পর আমরা পূর্ণোদ্যমে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলাম। ঐ সম্পর্কে কম্পাউণ্ড-সহ চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা একটি বাড়ী ১৬,০০০৲ (ষোল হাজার) টাকা দিয়া ঢাকায় ক্রয় করিবার কথা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর রাজী না হওয়ায় উহা কার্য্যকরী হয় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদম্ ও অন্যান্য স্থানে ভক্তগণ আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীরোহিনী কুমার মজুমদার ও শ্রীভুবন মোহন মুখোপাধ্যায় পুরী হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে একজন জার্মান কি আমেরিকান ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত

"ইডেন (?) যোগোদ্যান" ক্রয়ের জন্য গরুর গাড়ীতে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহারা জানাইলেন যে, স্থানটি অত্যন্ত মনোরম এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তথায় থাকিতে হইলে বন্দুক রাখার প্রয়োজন হইবে, কারণ আশে পাশের লোকগুলি ভাল নয়। ঠাকুর বলিলেন,—যেখানে বন্দুক না রাখিলে থাকা যাইবে না, সেখানে আশ্রম করার কোন দরকার নাই।

ঐ বৎসর পূজার বন্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, তিনি ঐ সময় ঢাকায় থাকিবেন এবং আমিও পূজার বন্ধে সপরিবারে তথায় থাকিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই পত্র পাইয়া, আমি সাগ্রহে ও সানন্দে পূজার বন্ধ তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় কাটাইতেই স্থির করিলাম। অষ্টমী পূজার দিন ঠাকুর শ্রদ্ধেয় বন্ধু বরদাচরণ রায় সহ যে বাড়ীতে ছিলেন, আমি সপরিবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হই। ঐ বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বড় বাড়ী ভাড়া করার জন্য আমাকে আদেশ দেন। তথাকার বন্ধুদের সাহায্যে নারিন্দা মহল্লায় "ব্রজধাম" নামে একটি ত্রিতল বাড়ী ভাড়া করা হয়। ঠাকুর ঐ বাড়ীতে তেতলার একটি কামরায় থাকিতেন। ঐ স্থানে অবস্থান কালে আমরা যাহাতে সকল বিষয়ে শান্তিতে ও আনন্দে থাকিতে পারি. সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরসহ আমরা আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ঢাকা সহরের নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া ঠাকুর কোন স্থানই আশ্রমের উপযুক্ত বলিয়া সম্মতি দেন নাই। একটি স্থানের মালিক "ভাল লোক নয়" এই অজুহাতেও আপত্তি তুলিয়াছিলেন। পূজার বন্ধ শেষ হওয়ার অল্প পূর্ব্বে, নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা যাওয়ার প্রশস্ত রাস্তাটির পাশে যে স্থানে লক্ষ্মণ সাধু ছিলেন, তাহার অতি নিকটে মাঠের মধ্যে একটি স্থান, আমাদের সঙ্গে যাইয়া ঠাকুর নিজে পছন্দ করিলেন। বলিলেন, "আশে পাশে ব্যবসায়ীদের বাড়ী আছে। ইহারা ভক্তলোক, কীর্ত্তনাদি প্রায়ই করে, সুতরাং এই স্থান ভালই হইবে।" আমরা কথাবার্ত্তা বলিয়া ঐ স্থান ক্রয় করা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন যে, ঐ মাঠের মধ্যে পুকুর কাটিয়া মাটি ফেলিয়া অন্ততঃ বৎসর সাতেক না রাখিলে তথায় দালান হইতে পারিবে না। ঠাকুর ইহা শুনিয়া বলিলেন, যেখানে দালান করিতে সাত বৎসর লাগিবে, সেখানে আশ্রম হইতে পারে না। অতঃপর ঢাকায় আশ্রম স্থাপনের আশা আমরা ত্যাগ করিলাম।

আমি নোয়াখালী ফিরিয়া আসার পর ঐ সনের অগ্রাহায়ণ ও পৌষ মাসে কলিকাতা হইতে ও পরে কাশী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র পাইয়া জানিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কোন ভক্ত রাণাঘাটের নিকটস্থ "বীরনগর" গ্রামে আশ্রমের জন্য বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি ক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কাশীতেও কয়েকজন ঐ উদ্দেশ্যে বাড়ীসহ দুইটি স্থান পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে ঐ সম্পর্কে আর কোন পত্র না পাইয়া মনে হইল যে, তিনি ঐ সকল স্থানও আশ্রমোপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই।

ঐ বৎসরেরই শেষভাগে, অথবা ১৩৩৭ সনের প্রথমভাগে চট্টগ্রাম হইতে আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত জানাইলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে পাহাড়তলী ষ্টেশনের সোয়া মাইল উত্তরে রেল লাইনের প্রায় সংলগ্ন একটি ছোট পাহাড়ের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ পাহাড়টী ৺মহেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ছিল। তিনি ঐ স্থানে কোন সাধুর আশ্রম হওয়ার বাসনা করিয়া একখানা ছোট টিনের ঘর ঐ পাহাড়ের উপর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পর পর কয়েকজন সাধুই তথায় অবস্থান করিয়া কয়েকমাস পরে জ্বরের উপদ্রবে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সময়ে পাহাড়টির তিন দিকেই ঘন জঙ্গলে আবৃত বহু ছোট বড় পাহাড় ছিল, তাহাতে সাপ, বাঘ আদি বহু হিংস্র জন্তুর বসতিও ছিল। লোকের বসতি রেলরাস্তার পশ্চিম ধারে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন ও ভয়সঙ্কুল ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তাহা আশ্রমের জন্য নির্দ্দেশ করায় আমরা সানন্দে ঐ স্থানেই আশ্রম প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ৺মহেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী ও সুযোগ্য পুত্র, উদারচেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নিকট আমাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সাগ্রহে এ পাহাড় দান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ঐ আশ্রম-স্থান নির্দ্দেশ করার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমান অখিল রায় ও অন্যান্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বর্ত্তমানে "কৈবল্যশক্তি" নামে পরিচিত বট-বৃক্ষতলে বসিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে আশ্রম হইবে। আশ্রমের পাহাড়ের উপরের টিনের ঘরখানার কোন দিকেই বেড়া ছিল না। আমরা

কয়েকজনে পরামর্শ করিয়া ঐ ঘরখানার চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়াইয়া সম্মুখে একখানা বারান্দার কোঠা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। পরে অন্যান্য অস্থায়ী আবাসগৃহাদি নির্ম্মাণ ও টিউবওয়েল বসান হইয়াছিল। ঘন জঙ্গল কাটিয়া পাহাড়ে উঠিবার জন্য খুব সরু একখানা পথও করা হইয়াছিল।

১৯৩০ ইং সনের ৭ই জুলাই ( ১৩৩৭ বাং ২২শে আষাঢ় ), পুরী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—

"..................আপনারা ১০ই শ্রাবণ তারিখে ঐ আশ্রমে চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎসব করিবেন; সেখানে সর্ব্বদা থাকার জন্য একটি লোক রাখিয়া দিবেন। যদি হরিবাবু ওখানে থাকেন তবে তিনি যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারেন, সেই বন্দোবস্ত করিবেন। আমি ফাল্গুন মাসের ১৫ই ভিন্ন ঐ আশ্রমে যাইব না। সকল ভক্ত-বৃন্দকেই এই বিষয় জানাইবেন। ঐ তারিখে ঐ আশ্রমে চিত্রপট নিয়া যাইতে কোনরূপ বাধা করিবেন না..................।"

এই পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, আসাম প্রদেশের 'লিডু' নামক স্থানে কোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ( উপরোক্ত হরিবাবু ) এই আশ্রমের সেবাইত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠার দুই, একদিন পূর্ব্বেই চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুযায়ী ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ বাং আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল। তৎকালে চট্টগ্রামে খুব অল্প সংখ্যক ভক্তই ছিলেন—যথা শ্রীমণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশ

চন্দ্র গুহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুধাময় দত্ত, ৺বিধুভূষণ বসু এবং আরও কয়েকজন। ইঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপরোক্ত গৃহের সংস্কার এবং আশ্রমের স্থান পরিষ্কার আদি সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনই উপস্থিত অল্প কয়েকজন ভক্ত আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে আশ্রমের পূজার জন্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাস করার কামরার জন্য এবং কিছু রিজার্ভ ফাণ্ড করার জন্য অবিলম্বে অন্ততঃ পক্ষে ২০,০০০৲ ( বিশ হাজার ) টাকার প্রয়োজন। তখনই উপস্থিত সকলে প্রায় অর্দ্ধেক চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা স্থানের ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তগণ যেন পরবর্ত্তী ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা ঐ আশ্রমের কার্য্যে চাঁদা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, এইরূপ পত্র দেওয়া সাব্যস্ত হয় এবং অবিলম্বে নির্ম্মাণের কার্য্যাদি আরম্ভ করা স্থিরকৃত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে একখানা কাগজে আঁকিয়া কোথায় ঠাকুর মন্দির হইবে এবং কোথায় স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তগণের পৃথক পৃথক বাসস্থান হইবে ইত্যাদি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের উপর নির্ম্মাণের কার্য্যভার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উপর সম্পাদকের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছিল এবং আমাকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ঐ ৩০শে আশ্বিনের মধ্যেই প্রায় ২৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ঐ তারিখে পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ফেনী কলেজের তৎকালীন

প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী ও নোয়াখালী শহরের কোন কোন ভক্ত আমার বাসাতে উপস্থিত হইয়া আশাতীত অর্থ সংগ্রহে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

## শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম প্রবেশ

শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া করিয়া ঐ ফাল্গুন মাসেই দোলোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে নোয়াখালীতে আমার বাসায় পদার্পণ করেন এবং কয়েকদিন পরে তথা হইতে আমি, পূর্ণবাবু আদি বহু ভক্ত সপরিবারে আশ্রম প্রবেশের জন্য নির্দ্ধারিত দিনের একদিন পূর্ব্বে ১৪ই ফাল্গুন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ চট্টগ্রাম রওনা হই। ট্রেনে একখানা বেশ লম্বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমরা প্রায় ২০।২৫ জন ছিলাম। সাক্ষাৎ নরনারায়ণ সান্নিধ্যে আমরা সমস্ত দিন অনির্ব্বচণীয় আনন্দে কাটাইলাম, পাহাড়তলী ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা সকলেই আশ্রমের দিকে চলিয়া যাই। তিনি ২।১ জন ভক্তসহ চট্টগ্রাম সহরে বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের বাসায় যাইয়া উঠেন। তৎপর দিন, অর্থাৎ ১৫ই ফাল্গুণ, শুক্লা দশমীর দিন প্রাতে বিধুবাবু ও চট্টগ্রামের আরও কয়েকজন ভক্তসহ শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা বাসে আশ্রমের পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় আশ্রমে আসাম, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত আমরা যাহারা ছিলাম, পরমানন্দে বন্ধু শৈলেনের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে ঠাকুর মন্দিরে লইয়া আসিলাম। তখন ঐ মন্দিরের তুইটি মাত্র কামরা ছিল। পূর্ব্বদিকের কামরাটিতে ঠাকুর থাকিবেন মনে করিয়া আমরা একখানা খাট ও তত্নপরি বিছানাদি পাতিয়া

রাখিয়াছিলাম। পশ্চিমের কোঠায় অর্থাৎ এখন যেখানে "শ্রীশ্রীকৈবল্য নাথের" চিত্রপট পূজিত হয়, তথায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে পূজা শেষ হইলে সেই কোঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় কি যে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যখন পুষ্প ও বিল্ব পত্রাদি শ্রীচরণে অর্পণ করিতে করিতে শেষ হইয়া গেল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ হস্তে অর্পিত পুষ্পাদি তুলিয়া আমাদের কাহারও কাহারও হাতে অঞ্জলি প্রদানের জন্য দিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার চেহারায়ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দের স্ফুরণ হইয়াছিল। আমি সেইদিন কি তাহার পরদিন ঐ সময় কল্পনাতীত আনন্দ অনুভব করার কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সময়ে শ্রীশ্রীগুরু দেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই ঐরূপ আনন্দের স্ফূরণ হইতেছিল," সেই দিন এবং সেই রাত্রে স্থানীয় জমিদার প্রাণহরি দাস মহাশয় সদলবলে আসিয়া আশ্রমে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকলে প্রসাদ পাওয়ার পর অধিক রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্য আমরা যে বিছানার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তথায় শয়ন করিলেন। আমি ও আরও ২।১ জন ঐ কামরারই মেঝেতে ঘুমাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিলেন, "এই কামরায় মোহন্ত থাকিবেন," আমি বলিলাম, "মোহন্তের থাকার ঘর পিছনে প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি এই কামরাতে থাকিবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অত্যন্ত দয়ার্দ্রভাবে আমাকে বলিলেন, "আমার তো কোন আশ্রমেই থাকার

গুরুর আদেশ নাই। কিন্তু আমার সমস্ত শক্তিই এই আশ্রমে থাকিবে সুতরাং আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই।" এই উত্তরে সাময়িক একটু হতভম্বের মত বোধ করিলেও ঠাকুরই কৃপা করিয়া ঐভাব স্থায়ী হইতে দিলেন না। ঐ কথার উপর আর কিছু বলা নেহাৎই ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমাদের সকলেরই কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুর অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় তখন হইতে আশ্রমেই অনেক সময়ে থাকিবেন, এবং আমাদের অনেক সময়েই শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে। ঠাকুর আশ্রমে থাকিবেন না, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, আশ্রমে আগত ভক্তগণ প্রথমে একটু বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেও, তাঁহারাও অল্প সময়ের মধ্যেই পুনঃ ঠাকুরের আদেশ মান্য করাই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া মনে করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। দোল পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত বুড়ির ঘর প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া পরমানন্দে বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন করা হইল।

ঐ সময়ে আশ্রমে একটি দোল প্রস্তুত করা হয়াছিল ও তাহারই উপরে চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসান হইয়াছিল। ঐদিন অথবা তৎপর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে আশ্রমের সংলগ্ন উপরের পাহাড়টি দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ পাহাড়টির উপর আপনি বাড়ী করিয়া বাস করিলে, ছেলেপিলে সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। ঐ স্থানে বাড়ী করিবার চেষ্টা করিবেন।"

পাহাড়টি তৎকালে "কর্ণেল সাহেবের পাহাড়" বলিয়া খ্যাত ছিল। সে সময়ে তাহাতে একটি বৃহৎ পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ ছিল।

দালানটির নানাস্থানে ও চতুর্দ্দিকে বহু বিরাট গাছ থাকায় উহাতে বড় বড় সাপ ও বাঘ, শূকরাদি বন্যজন্তু থাকার আশঙ্কায় কেহ-ই ঐ পাহাড়ে তখন যাইতনা, শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ স্থানে আমার বাড়ী করার আদেশ দেওয়ায়, আমি উহা সরকার হইতে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হইলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ঐ পাহাড় রেলওয়ে ল্যাণ্ড (জমি) বলিয়া দুইবার সেটেলমেণ্টে রেকর্ড হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বন্ধু রেল অফিসের কর্ম্মচারীগণ আমাদিগকে জানাইলেন যে, উহা প্রকৃতপক্ষে Railway relinquished land, অর্থাৎ যদিও রেলওয়ের জন্য প্রথমে ঐ জমি acquire করা হইয়াছিল, পরে অনাবশ্যক বিধায় রেলওয়ে কোম্পানী তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। তৎপর তৎকালীন Settlement Officerএর নিকট তদ্বির করিয়া ঐ জমি Settlement Recordএ সরকারের জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা সত্বেও আমার তাহা পাইতে নানাপ্রকারের যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পাহাড় অতি অল্প মূল্যেই আমি পাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই পাহাড় বন্দোবস্ত পাওয়া সম্পর্কে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, মোমিন ও চট্টগ্রামের তৎকালীন খাসমহল অফিসার মৌলভী সাদরলওয়ালা আমাকে আশাতীতভাবে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ মোমিনকে আমি যখন প্রথম এই পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার কথা বলিয়াছিলাম, তখন এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাঁহাকে জানাইয়া ছিলাম যে, আমার গুরুদেবের আশ্রম উহার সংলগ্ন পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় আমার ঐ পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি নেহাৎ আপনভাবে আশ্রমের কথা যেন দরখাস্তে উল্লেখ না করি এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে অশ্রমের কথা লিখিলে গভর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত দিতে রাজী হইবেনা, কারণ আশ্রম মাত্রেরই উপর গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সন্দেহাত্মক নজর আছে। তিনি মিঃ সাদরলওয়ালাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে আমি যাহাতে ঐ পাহড় বন্দোবস্ত লইতে পারি, সেই ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে ও কৃপায় পুরাতন কর্ণেল সাহেবের কুঠির ভিত্তি যতটা ছিল, ততটা লইয়াই দোতালা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছি, যদিও প্রথমতঃ একটি খুব ছোট বাড়ীই আশ্রম বাসের জন্য নির্ম্মাণ করার আমার ইচ্ছা ছিল, এই বাড়ীতে থাকিয়া আমার উত্তর পুরুষেরাও শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবা করিবে এই কথা এবং এই মর্ম্মে আরও কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও অন্যান্য কোন কোন ভক্তকেও জানাইয়াছিলেন। এই বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি এই কারণেই শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের বরাবরে দেবোত্তর করা হইলেও আমি এবং আমার অবর্ত্তমানে আমার বংশধরগণ তাঁহার সেবায়েত সূত্রে এই বাড়ী ও জমির দখলকার থাকিবে বলিয়া আমার দেবোত্তর দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দলিলের মুসাবিদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখান হয় এবং তিনি তাহা অনুমোদন করার পর উহা ষ্ট্যেম্পেড্ কাগজে রেজেষ্ট্রী করা হয়।

আশ্রম প্রবেশ উপলক্ষে কৈবল্যধামে ছয়, সাত দিন থাকিয়া ঠাকুর আশ্রম ত্যাগ করেন। আর দেহ নিয়া তিনি কখনও তথায়

যান নাই। আশ্রম প্রবেশের তুই তিন বৎসর পর তাঁহারই আদিষ্ট আমার ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হইলে আমি একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "এখন তো আশ্রমের সান্নিধ্যে আমার বাড়ী হইয়াছে, তথায় গিয়া আপনি থাকিলে সকলেই যথেষ্ট আনন্দ পাইবে। ঐ বাড়ী ত' আর আশ্রম নয়! সুতরাং তথায় যাইতে আপনার আপত্তি হইতে পারেনা।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "উহাও আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে। সুতরাং সেখানেও আমার থাকার যো নাই। জানেন ত কিষণলাল সম্পর্কে গুরুর আদেশ অমান্য করায় আমার এখন স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।" একটু হাসিয়া বলিলেন "আবারও আদেশ অমান্য করিলে কী হয়, তিনিই জানেন। "আমি মনে মনে ভাবিলাম যে গুরুর আদেশ অমান্য করায় ভালই হইয়াছে, নচেৎ আমার ন্যায় অতি তুর্ব্বল ও পাপী তাপীদের উপায় কি হইত?

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, "আমাদের কৈবল্যধাম আশ্রম কি কাশীর ন্যায় বৃহৎ তীর্থ স্থান হইবে?" তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "ইহা আসমুদ্র ব্যাপ্ত হইবে এবং যেখানে কুম্ভ মেলা হয় সেরূপ বৃহৎ স্থান হইবে।" ইতি পূর্ব্বে তিনি অনেক সময় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ঐ আশ্রমে শ্রীগুরু ও বহু দেবদেবী সকল সময় উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীজয়ন্তী মা উহার রক্ষাকারিনীরূপে আছেন। কৈবল্যধামে আসিলে সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যাইবে এবং বহুদূরে দেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ধর্ম্মপিপাসুগণ ঐ স্থানে আসিয়া পরম শান্তি পাইবেন এবং ঐ আশ্রমেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবে না।

কালে কোন মহাত্মা ইহার মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। নিম্নে এই সম্পর্কে তাঁহার লিখিত কয়েকখানা পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১। "* * * * ঐ আশ্রমে আমার প্রাণ, প্রাণেরই ঈশ্বর শ্রীসম্পদ ভগবানের স্বরূপ শক্তি শ্রীগুরুদেবের পরমানন্দ সাধ্য আত্মশক্তি তাহান স্বজন, স্বগণ সহকারে ঐ কৈবল্যধামে কৈবল্য নিত্য বিস্তার করিয়া ভগবৎ বিভূতি স্থান সমূহ তীর্থাদি সমস্ত ত্রিলোকের গোলকাদি বৈকুণ্ঠ কৈলাসের আদর্শ শক্তি নিয়া, গয়া প্রভৃতি পুরুষোত্তমীয় শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি যাবতীয় অধিষ্ঠানীয় সমস্ত বিশুদ্ধ শক্তি নিয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন। কৈবল্য শক্তিতে সিংহবাহিনী প্রভৃতি মহাদেবীর যত রকম বিভূতি আছে, সাবিত্রি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি বিস্তাররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, ঐ স্থান চ্যুত হইয়া একপদও কোথাও যায় না। গয়া প্রভৃতি বিষ্ণু পদাদিতে পিণ্ড দানে, গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থে স্নানোৎসবাদিতে যে সকল ফলশ্রুতি আছে, তাহার সমস্ত ফল ওখানে বাস, অবগাহন, পিণ্ডাদি দানে কি শুশ্রূষাদি দ্বারা পূর্ণরূপে ফলবতী হইবে, ইহা শ্রীমুখে আপন হইতে প্রকাশ করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাকে কোন আশ্রমেই থাকার অধিকার দেন নাই। যেমনভাবে বলিতেছি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এমনই ভাবে এই দেহ ছাড়িয়া প্রারব্ধ দণ্ড মুক্তি করিতে হইবে। এই সংবাদ শ্রীমান শুভবাবুর নিকট লিখিয়া ছিলাম, তাঁর ঐ আশ্রমে প্রাণ রহিয়াছে জানিবেন। * * * আপনারা এই বাক্য বিশ্বাস করিয়া অনন্যমনে ভ্রমশূণ্য হইয়া ঐ কৈবল্য সম্ভারের অধিকারের নিত্য শুশ্রূষা করিয়া ধন্য হউন, এই প্রার্থনা। আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বদাই থাকি, যেই রকম আসা যাওয়া করিতে

ছিলাম সেই রকম করিব। এই দেহটি কৈবল্যনাথের নিকট নিয়া কৈবল্য আশ্রমকে কলুষিত করিব না। ইহাই গুরুদেবের ইচ্ছা। * * * ঐ আশ্রমে আমার প্রাণ রহিয়াছে জানিবেন। যাহাতে ঐ আশ্রমের নিয়মিত সেবা ও যাহানরা ওখানে উপস্থিত থাকিবেন তাহানদের যেন কোনরূপ অভাব না হয় ইহাই আপনাদের উপর ভার দিয়া আপনাদের এই কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। কালে কোন মহাজন দ্বারা ঐ আশ্রম মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া এই ত্রিলোক ধ্বনিত হইয়া যাইবে।”

২। “কৈবল্যধামের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান সমস্ত কৈবল্যধামের অধীনে আসিবে। যত খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর সাধক এখানে আসিয়া সাধনা করিবে, কুম্ভ মেলায় যেমন সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মেলন হয় তদপেক্ষা বৃহৎ সম্মেলন এই স্থানে হইবে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকের তীর্থস্থান হইবে। দেবতারা সর্ব্বদা কৈবল্যধামে যাতায়াত করেন, জগন্নাথও অধিকাংশ সময় এই ধামেই থাকেন। অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া কৈবল্যধামে শয়ন করিয়া আছেন। মন্দির ঠিক তাঁর জঙ্ঘার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়া সতত কৈবল্যনাথের পদসেবা করিতেছেন। মহাশক্তি কালী এক পদ কামশ্রীকুণ্ডে অপর পদ কৈবল্যকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সতত তথায় দণ্ডায়মানা আছেন। জয়ন্তী মা এখানে সতত অবস্থান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান আছেন। কৈবল্যধামের বৃক্ষ, লতা, পত্র প্রত্যেকটি পবিত্র ও অশরীরিদিগের আশ্রয়স্থল। এই ধামে দেব, দেবী, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্বদা বিহার করেন, তদগত চিত্ত যাঁরা দেহরক্ষা করিয়াছেন তাঁরাও সকলে আসিয়া এই ধামে মিলিত হইয়াছেন।

একটু নিগম হইলেই এই সব দেখা যায়, বুঝা যায়, কৈবল্যধাম সকল তীর্থের বীজ স্বরূপ। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ণ দৃষ্টি ইহার উপর রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এই ধামেই হইবে এবং এই ধাম হইতে প্রচারিত স্বভাব ধর্ম্মই বিশ্বের লোকের ধর্ম্ম হইবে। কালে কোন মহাপুরুষ আসিয়া এই ধামের মাহাত্ম্য ত্রিলোক প্রচার করিবেন * * *।"

১৩৩৮ সনের শ্রীশ্রীতুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র দিয়া আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমরা আশ্রমে দুর্গাপূজা করিব কি না এবং যদি আমাদের ঐ পূজা করা তিনি সঙ্গত বোধ করেন, তাহা হইলে কি মূর্ত্তিতে পূজা করিব। সে সময়ে আমি তাঁহাকে আশ্রমে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি সিমলা হইতে আমাকে অবর্ণনীয় স্নেহমাখা ও আশীর্ব্বাদযুক্ত যে সকল পত্র দিয়াছিলেন তাহার উপরের পোষ্টেল সিল্ ( Postal Seal ) এর তারিখ দিয়া নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

৪-১০-৩১ ইং—"৺মায়ের পূজায় ... যে ভাবে সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিবেন সেইভাবেই হইবে প্রতিমা কিম্বা ঘটে কি পটে। ... ৺পূজার পরে আপনার সঙ্গে দেখা করিব।..."

১৭-১০-৩১ ইং "......কোন চিন্তা করিবেননা। ৺মায়ের অর্চ্চনা বিশুদ্ধ ভক্তি শ্রদ্ধায় সাত্বিক ভাবে করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়, মা আপনাদের অর্চ্চনায় তৃপ্তি লাভ করুন এই প্রার্থনা। ...বিশেষত আমি তো কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি আপনার সঙ্গে দেখা করিব। বাসা-ই থাকিবেন।..."

যতদূর স্মরণ হয় পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ভক্ত জানাইয়া ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন যে মায়ের পূজা চিত্রপটে, মৃন্ময়ী বা প্রস্তরময়ী যে কোন মূর্ত্তিতে সম্পন্ন হইতে পারে অর্থাৎ আমরা যে কোন মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করিতে পারি।

আমাদের দেশে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই পূজা হয় বলিয়া আমরা ঐরূপ মূর্ত্তি করাইয়া ঢাক, ঢোল সহকারে বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত-ই ঐ পূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন পশুবলির ব্যবস্থা তাহাতে করা হয় নাই। ঐ প্রতিমা আশ্রমের নাটমন্দিরের পূর্ব্বধারে বসান হইয়াছিল। পূজার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া ঐ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ জানাইলে তিনি খুব খুসী হইয়াছিলেন বলিয়াও মনে হইয়াছিল।

দুই তিন বৎসর এভাবে দুর্গাপূজা হওয়ার পর, আশ্রমে শ্রীশ্রীকৈবল্য নাথের যে মূর্ত্তি সর্ব্বদা পূজিত হইতেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ মূর্ত্তিই আশ্রমে ঐ পূজা হওয়া ভক্তগণ সমবেত ভাবে স্থির করেন এবং তদবধি ঐভাবেই পূজা হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন যে ৺দুর্গাপূজার সময় পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে যথাসম্ভব ভক্তমাত্রই উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

১৩৩৮ বাং সনে ঐ আশ্রমে প্রথম দূর্গাপূজা হওয়ার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ঐ সনে শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীমণীন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত, আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের উদ্যোগে এবং তৎকালীন চট্টগ্রাম পোর্টের সুপারভাইজার সুরেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে

নাটমন্দির ও তৎপূর্ব্বদিকের পুরুষ মহিলাদের লম্বা যাত্রীনিবাস ও তৎপূর্ব্ব ধারের Retaining wall ( দেওয়াল ) প্রস্তুত করা হয়। সেই সময় ঐ পাহাড়ের চারিধারের জঙ্গলাদি কাটিয়াও রাস্তা করিয়া অনেকটা পরিষ্কার করা হয়। ঐ বৎসরই আশ্রমের পাহাড় সংলগ্ন উপরের পাহাড়ের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং কর্নেলের কুঠী নামে পরিচিত তৎকালে বৃহৎ বৃক্ষাদি দ্বারা ঢাকা খুব পুরাতন একখানা দালানের ভগ্নাবশেষ অতি কষ্টে পরিষ্কার করাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট এখন যে দোতলা বাড়ীটি অবস্থিত আছে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। এই পাহাড় দুইটির তিনদিকেই সেই সময়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ এবং কিছু দূরে দূরে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছোট ছোট পাহাড় ছিল। তৎকালে ব্যাঘ্র, বরাহ, বানর ও হরিণ আদি সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত।

আশ্রমের পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি পার হইয়া গেলে একটি বেশ বড় আঁকা বাঁকা হ্রদ আছে। আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি সরুপথে সদলবলে হাঁটিয়া ঐ হ্রদ প্রথম অবস্থায় কয়েকবার দেখিয়া আসিয়াছি। এখনও কেহ কেহ তাহা দেখিতে যান। আশ্রমের পশ্চিমদিকে প্রায় দুই মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের দৃশ্য অতি মনোরম। উপরের পাহাড়ের বাড়ীর বারান্দায় এমনকি সমস্ত দরজা খুলিয়া দিলে যে কোনও কামরায় বসিয়া অসীম সমুদ্রের নীল জলের এবং মাঝে মাঝে জাহাজ ও নৌকা চলাচলের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আস্তে আস্তে সূর্য্যদেবের অতল সমুদ্রে অবগাহন ও নিমজ্জনের দৃশ্য বর্ণনাতীত ও

মনোমুগ্ধকর। তখন আপনা হইতেই অপ্রত্যক্ষভাবে কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভগবৎচরণে মন প্রাণ ঢলিয়া পড়ে। নির্ম্মল চন্দ্রলোক রাত্রে সমুদ্রের স্নিগ্ধ। মধুর দৃশ্যও বর্ণণাতীত। প্রাতঃকালে সুর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সূর্য্যালোক পূর্ব্বধারের পাহাড়গুলির অন্ধকার স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ রশ্মি আস্তে আস্তে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখন চতুর্দ্দিকের বিশেষতঃ পূর্ব্বদিকের নানাবর্ণে রঞ্জিত অসীম আকাশের স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্যে ভগবৎ ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হয়। আশ্রমের পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানের সবুজ মাঠ ও গ্রামগুলির সবুজ পাতায় ঢাকা বৃক্ষরাজি ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। উভয় পাহাড়ই খুব সতেজ বহু নিম, বেল, আম, কাঁঠাল, হরিতকী, জাম, কদম্ব, কুল, পেয়ারা, লিচু, আদি ন্যানাফল এবং অসংখ্য প্রকারের ফুলের বাগানে সুসজ্জিত থাকায় এবং মাঝে মাঝে অতি বৃহৎ গর্জন, তেলসর, ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় এই স্থানটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, মধুর নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পরে ৩১-৮-৩৭ ইং ( ১৩৪৪ সনের ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে ) কৈবল্যধামে একটি ষ্টেশন করার জন্য আমরা নোয়াখালী হইতে তদানীন্তন A. B. Railwayর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাই। তাহার ফলে দুর্গাপূজা উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা ৪।৫ দিনের জন্য উভয়দিকের গাড়ী কৈবল্যধামে থামাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে যথেষ্ট যাত্রী গমনাগমন করিয়াছে দেখিয়া কয়েক বৎসর 'কৈবল্যধাম' নামে অস্থায়ী ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত

মহাযুদ্ধের সময় ঐ ষ্টেশন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৮ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশীসংখ্যক যাত্রী ঐ ষ্টেশন হইতে যাতায়াতের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

আশ্রমের 'কৈবল্যশক্তি' নামক বৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিমদিকে 'কৈবল্যকুণ্ড' নামক পুষ্করিণীতে বহু সহস্র লোক অবগাহন করা সত্ত্বেও ইহার জল ভালই আছে। কৈবল্যকুণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব কোণে 'গোপাল স্মৃতি' নামে পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পনাদি কার্য্যের জন্য একখানা পাকা ভিটি বিশিষ্ট আংশিকভাবে দেওয়ালে ঘেরা টিনের ঘরে শ্বেতপাথরের উপর শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিশিষ্ট অতি মনোহর পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে ঐ পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানেরই ফল হইবে। ঐ স্থানে বহু লোক প্রতি মাসে শ্রাদ্ধতর্পনাদি করিয়া শান্তি পাইতেছে। ঐ গৃহের উত্তর দিকে কামধেনু মাতার ও ভক্ত ময়নার সমাধির উপরে অতি সুন্দর একখানা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আশ্রমের দ্বিতীয় মোহন্তমহারাজ এই মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার দেহত্যাগের পর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে শিবশক্তির দোতলা মন্দির অবস্থিত। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ই একটি বেলগাছ ঐ স্থানে ছিল। বৎসরেক পরে তাহার গায়ে একটি অতি ছোট অশ্বত্থ বৃক্ষ উঠিতে দেখিয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ঐ বেলগাছটি খুব বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু অশ্বত্থ বৃক্ষটি প্রায় পূর্ব্বরূপই আছে।

এতদ্ব্যতীত আশ্রমে হরগৌরী মন্দির, যাত্রী নিবাসাদি অনেকগুলি পাকা দালান পরে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে মহোৎসবাদিতে ভোগ রান্না ও প্রসাদ বিতরণের অতি সুবন্দোবস্ত আশ্রম পাহাড় দুটীর নিম্নভাগে করা হইয়াছে। ভোগ রান্নার জন্য বৃহৎ পাকাঘর প্রস্তুত হইয়াছে।

উপরোক্ত হরগৌরী মন্দির হইতে উপরের পাহাড়ে উঠিবার সময় রাস্তার দুইপার্শ্বে পাহাড়ের পাদদেশে ঝরণার জলে পূর্ণ 'শ্রীকামশ্রীকুণ্ড' অবস্থিত। উহার জল খুবই পবিত্র ও সুস্বাদু। বৎসরেক পূর্ব্বে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে হরগৌরী মন্দিরের পশ্চিমে টিউবয়েল এবং ইলেকট্রিক পাম্প আদি বসাইবার পূর্ব্বে হ্যাণ্ডপাম্পের সাহায্যে এই কামশ্রীকুণ্ডের জলই পানীয় জল রূপে ব্যবহৃত হইত। এক বৎসর ৺দুর্গাপূজা উৎসবের সময় ঐ জলেই আমরা কর্পূরের গন্ধ পাইয়াছিলাম।

এই আশ্রমের প্রথম মোহন্ত মহারাজ ৺হরিপদ বন্দোপাধ্যায়ের অতি গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। নিস্তব্ধ সময়ে তানপুরা বাজাইয়া গান করিয়া আনন্দ উপভোগ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি সাংসারিক ভালমন্দের ধার ধারিতেন না। পরমার্থতত্ত্ব আলোচনাতেই তাঁহার পরমানন্দ দৃষ্ট হইত। ১৩৪১ সনের ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অতি ভক্তিভরে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের নিয়মিত সেবাপূজা সম্পন্ন করিয়া প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ফেনীতে গুরুভ্রাতা প্রমথবাবুর বাসায় তিনি পরলোক গমন করেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এবং আমি গুরুভ্রাতা ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলাম।

তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি জানাইলে তিনি বলিলেন, "আজ হইতে শ্যামই ( শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) আশ্রমের মোহন্ত হইল। এই সংবাদ সকলকে জানাইয়া দিবেন।" আমি তৎক্ষণাৎ হরিদাদার মৃতদেহের নিকট সম্মিলিত সকলের সমক্ষে এই সংবাদ প্রচার করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ফেনীর শ্মশান ভূমিতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। তাঁহার চাকুরীর সময়ে সঞ্চিত কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচহাজার টাকা তিনি রেজেষ্টারীকৃত দলিল ( Trust Deed ) মূলে পাহাড়তলী আশ্রমে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

এই আশ্রমের দ্বিতীয় মোহন্ত মহারাজ—১৩৬৬ বাং সনের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের নাম স্মরণ করিতে করিতে এই কৈবল্যধামেই দেহত্যাগ করেন। তিনি ২৫ বৎসর আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া কৈবল্যধামের ও অন্যান্য আশ্রমগুলির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। আশ্রমগুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে তিনি অশীতিপর বয়সেও কোন কষ্টই সহ্য করিতে পরান্মুখ হইতেন না। আশ্রমবাসী ব্যক্তিমাত্রের প্রতিই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় এই আশ্রমে কাহারও অলসভাবে সময় কাটাইবার যো ছিলনা। তিনি স্বয়ং যে রূপ সকল সময় আশ্রমের চিন্তায় ও কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন সেইরূপ আশ্রমবাসী সকলকেই নানাকাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেহত্যাগের পূর্ব্বেই তাঁহাকে 'নাম' দেওয়ার অধিকার দিয়াছিলেন এবং ইহাও বারংবার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তখন হইতে যেন সকলেই ঐ মোহন্তের নিকট হইতেই নাম নেয় কারণ তিনি নাম দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাকে দিয়াছেন।

আশ্রমের দ্বিতীয় মোহন্ত মহারাজ তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে নাম দেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। উক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ১৯৫৬ সনের জুলাই মাসে আশ্রমের সেবায় যোগ দিয়াছিলেন। পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার পরমানন্দ ৭০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেও আশ্রমের হিসাব পর্য্যবেক্ষণ, পত্রাদি লেখা, আগন্তুকদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি নানাকাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকিয়াও রাত্রে প্রায়ই কিছু সময় তিনি পাহারাও দিতেন। তৎকালীন মোহন্ত মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে "নাম" দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়ায় তিনি নানাস্থানে বহুলোককে "নাম" দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন। গত ফাল্গুন মাসে তিনি আশ্রমের ট্রাষ্টী ও ভক্তগণের সম্মিলিত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আশ্রমের তৃতীয় মোহন্ত মহারাজ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই আশ্রমে অশীতিপর বৃদ্ধা কুলদিদি, সরোজিনী দিদি, প্রিয় ভাষিণী দিদি ও জ্ঞানদা দিদি আদি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীশ্রীকৈবল্য নাথের সেবা করিতেছেন। পুরুষদের মধ্যে শ্রীমান স্বদেশ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সূর্য্যলাল সাহা, কীর্ত্তনীয়া শ্রীমান ইন্দ্র, যোগেন্দ্রবাবু, শ্রীনগেন্দ্র সরকার, শ্রীমান কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান মানিক ও আবু আদির সেবাপরায়ণতা, আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশ্রমের সম্পাদক রায়সাহেব ডাঃ অনাথবন্ধু সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে সস্ত্রীক তথায় বাস করিয়া আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পর হইতেই অনন্যমনা আশ্রম সেবক এবং আশ্রমাগত ভক্তমাত্রেরই অতি প্রিয় নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৩৬৬ বাং সনের ২৮শে শ্রাবণ, অন্যান্যদিনের ন্যায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের মঙ্গলারতি সমাপন ও বাল্যভোগের প্রসাদ গ্রহণান্তে পূজার জন্য ফুল, তুলসীপাতা, আদি তুলিয়া ঠাকুর মন্দিরে রাখিয়া দিয়া পাঁচ, সাত মিনিটের মধ্যেই পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎকালীন মোহন্ত মহারাজ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটি কাল বর্ণের লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের পেছনে পেছনে যাইতেছে। মোহন্ত মহারাজও তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার এখন যাওয়া হইবেনা। মোহন্ত মহারাজ স্বয়ং নরেন্দ্রদাদার মৃত্যুর অব্যাবহিত পরেই আমাকে এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন।

## শ্রীশ্রীজয়ন্তীমা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে এবং তাঁহার পত্রে আমাদিগকে জানাইয়া ছিলেন যে শ্রীশ্রীজয়ন্তীমা পাহাড়তলী কৈবল্যধাম আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।

তিনি যে বস্তুতঃ কে, তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার পত্র হইতে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শোনা গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি জগৎজননী মহাশক্তির সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া এখন সিদ্ধ দেহে, লোক নেত্রের অগোচরে জগৎকল্যাণের মহাব্রতে ব্রতী আছেন। তিনি কৈবল্যধামের অধিষ্ঠাত্রীরূপা বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। উক্তধাম প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি পৃথিবীর নানা দূর্গম স্থান হইতে অলৌকিক হইয়াও লৌকিক উপায়ে ভাবাবেসে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন, ঐ সকল পত্র হইতে জানা যায় যে মার বহু সেবকবৃন্দ সম্ভবতঃ তাঁহারই ন্যায় সিদ্ধ দেহে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচরণ করিতেছেন।

সূক্ষ্মদেহধারিনী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার "বিচ্ছেদানল" নামক বিধি "লিওপুল" "এ্যান্টার্কটিকা" দক্ষিন মেরু (কুমেরু) হইতে ১২।৭।২১ ইং তারিখে লিখিত হইয়া, U. S. A. Philadelphia তে Posted হইয়া পাহাড়তলী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ১০ বৎসর পূর্ব্বে পাহাড়তলী Loco office এ Car. Supt. এর নামে পৌঁছে। ইহা ঐ পত্রের কভারের উপরের পোষ্টেল সিল ( Seal ) হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

## 'যাদবপুরে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম

১৩৪৯ সনের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর পত্রদ্বারা আমাকে জানান যে, কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে ঐ সনের ১৩ই ফাল্গুন আর একখানা আশ্রম আমাদের পাহাড়তলী আশ্রমের শাখা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যেন কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়াই তথাকার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হই। এই সংবাদে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইলাম। আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৩।৪ দিন পূর্ব্বেই কলিকাতা যাইয়া আমি আমার স্ত্রী ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান রামময় ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ননী সহ আমার আত্মীয় শ্রীমান

অরুণচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে উঠিলাম। তথায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে কিছুদিন যাবৎ ঠাকুর নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে কেহ যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে না আসে। তৎপর ঐ আদেশ আমার প্রতি প্রযোজ্য নহে জানিতে পারিয়া, আমি একাই যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলাম। তিনি সহাস্য বদনে আশ্রমের কাজে লাগিতে উপদেশ দিলেন।

যাদবপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্থানে যাইয়া দেখিলাম তথায় একখানা ছোট দোতলা বাড়ী উঠিয়াছে। আগন্তুক যাত্রীদের থাকার জন্য তাহার অল্প দূরে একখানা বারান্দাবিশিষ্ট একতলা বাড়ী ও রান্নাঘর আদি ভাড়া করা হইয়াছে। ঐ বাড়ীতে চট্টগ্রাম হইতে আগত পাহাড়তলী কৈবল্যধামের মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের, শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযামিনীভূষণ আদিত্য, শ্রীজয়কালী দিদি, ফেণী হইতে আগত পরলোকগত বন্ধু যামিনীকুমার সাহা, তাঁহার স্ত্রী এবং আরও দুই একজন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবাসের দিন প্রাতে আমার স্ত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ননী ও পুত্র শ্রীমান রামময় আসিয়াও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন গুরুভ্রাতা ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী ও আরও কয়েকজন আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীটির চতুর্দ্দিকেই খালি মাঠ ছিল। আশ্রমের স্থানটি যিনি দান করিয়াছিলেন, পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় সেই গুরুভ্রাতা ডাক্তার ক্ষিতিভূষণ সেন মহাশয়ের, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানা বাড়ী কিছুদূরে ছিল। তাহাতেও কোন কোন আগন্তুক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় যাদবপুর প্রায় নির্জ্জন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এখন যে স্থানে বহু হাজার ছোট বাড়ী দেখা যায়, সে স্থানে তখন ছিল বিরাট মাঠ এবং বহু দূরে দূরে দুই একখানা বাড়ী দেখা যাইত। আশ্রমের নিকটে দোকান কি হাট বাজার কিছুই ছিলনা।

ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসবের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসব সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন-আদিতেও যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের তুলনায়, তৎকালে প্রায় নির্জ্জন সেই স্থানে মহোৎসবে লোক সংখ্যা অনেক কম হইলেও সেবারের অন্নপ্রসাদ ও সত্যনারায়ণের সিন্নি প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল তাহারা আজ পর্য্যন্ত তাহা ভুলিতে পারে নাই। ফেণীর গুরুভ্রাতা যামিণীকুমার সাহা মহোৎসবের রান্না আদিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হওয়ায় পরস্পর আলাপ পরিচয়ে এবং একযোগে একই ভাবের উদ্দীপনায় সকলেই আনন্দ অনুভব করিলেও একটী বিষয়ে সকলেই একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী বহুদূর হইতে আগত ভক্তগণও তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করেন নাই। তিনি ঐ সময় ১১নং আর্ল স্ট্রীটে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত পরলোকগত ৺কুঞ্জলাল মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। প্রতিনিয়ত সেবাকারী অপর ভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় ও কুঞ্জবাবু ছাড়া স্থানীয় কি বহিরাগত কোনও ভক্তকে আমি সেইবার কলিকাতা পৌঁছিয়া উৎসব

শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট যাইতে দেখি নাই। ঠাকুর স্বয়ং মহোৎসবের দিন পর্য্যন্তও আশ্রমে পদার্পন না করায় পুরুষ ও মহিলা সকল শ্রেণীর ভক্তগণের মুখেই ভীষণ বৈরাগ্যের ছায়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, ঠাকুরের দর্শন পাইবনা জানিলে অতদূর হইতে এই উৎসবে আসাই হইতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উৎসবের অধিবাস দিন হইতেই কুঞ্জবাবু ও অক্ষয়বাবুকে ঠাকুর যেন অন্ততঃপক্ষে কিছু সময়ের জন্য উৎসব প্রাঙ্গণে যাইয়া সকলকে দেখা দেন এই প্রার্থনা করার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা সকল সময়েই আমাকে ঐ বিষয়ে পালটা অনুরোধ করিয়া নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা সাহস করিতেছেন না দেখিয়া আমার অনুরোধ করার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও মুখ ফুটিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস হইল না।

মহোৎসবের পরদিন আমি আমার স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ননীকে লইয়া উৎসবের স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীমান অরুণের বাড়ীতে আসার পথে কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর দর্শন করার মানসে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ আমি উপরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া সঙ্গীগণকেও তাঁহার সান্নিধ্যে নিলে তিনি সকলকেই সহাস্য বদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমরা উৎসবের স্থান ছাড়িয়া আসার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে কোনও কোনও ভক্তের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রফুল্লতাব্যঞ্জক সাদর সম্ভাষণ পাইয়া সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, একবার যদি অন্ততঃপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তিনি উৎসব স্থানে যান তাহা হইলে সকলেই যথেষ্ট আনন্দ পাইবে, নচেৎ সকলেই গভীর

নৈরাশ্যের ভাব নিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবে। এই কথায় ঠাকুর তথায় যাইতে সম্মত হইলেন এবং "ত্রেরাত্র" বাস করাই সঙ্গত বলিয়া আমাদিগকেও তথায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাইয়া ঠাকুর শীঘ্রই আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দিলে, তথায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একখানা মোটর গাড়ীতে উৎসবের স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে উপস্থিত সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ধন্য হইল। জানি না কি কারণে তিনি রাস্তায় দাঁড়ান মোটর হইতে না নামিয়াই পুনঃ তৎকালীন বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উপস্থিত ভক্তগণও সেইদিন তথায় প্রসাদ গ্রহণান্তে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

এই আশ্রমও "শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম" নামে অভিহিত হইল। ঠাকুর উপরোক্ত ডাক্তার দা, মনীন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় ও পরলোকগত ইন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে এই আশ্রমের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, বাল্যকাল হইতে তাঁহার সেবক শ্রীমান যামিনীরঞ্জন আদিত্যকে ঠাকুর ঐ আশ্রমের সেবাইত নিযুক্ত করিলেন। তৎপূর্ব্বে সে বহু বৎসর পাহাড়তলী আশ্রমে থাকিয়া যথাসাধ্য শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবা করিয়াছিল। এখানে তৎকালীন অতি অল্প সংখ্যক ভক্তের সাহায্যেও আনুকুল্যে সে কয়েক বৎসর অতি সুচারুরূপেই সেবাইতের করনীয় পূজা অর্চ্চনা ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা আদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। অনেক সময় রন্ধনাদিও তাহাকে নিজ হস্তেই করিতে

হইত। পরে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বা প্রারব্ধানুযায়ী, সে মাঝে মাঝে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া কিছুদিন হাসপাতালেও ছিল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুর মন্দিরের দোতলায় এক কোঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পাতুকা ও সত্যনারায়ণের মূর্ত্তির চিত্রপট সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইত এবং তাহার পার্শ্বস্থ কোঠায় সেবাইত ও অন্য দুই একজনও শয়ন করিত। মন্দিরের নীচের তলায় অফিসাদি ও তাহার পিছনে ভোগ রান্নার ঘর ছিল। মন্দিরের সম্মুখে তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহার উপরে একখানা টীনের বৃহৎ অট্‌চালা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর, ১৩৫৬ সনে পাহাড়তলী কৈবল্যধামের তৎকালীন মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাদবপুর আশ্রমে যাইয়া অন্ততঃ পক্ষে সাময়িক ভাবে শ্রীমান যামিনীকে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিতে বলিয়া শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়কে তথায় সেবাইত নিযুক্ত করিলেন।

এই আশ্রমেরও ক্রমশঃ সর্ব্বদিকেই উন্নতি হইতেছে। দেশ বিভাগের পর বহুসহস্র পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু আসিয়া যাদবপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার পর জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ও মাঠগুলি সুন্দর স্কুল, কলেজ, বাজার ও বাসস্থানাদিতে পরিপূর্ণ হওয়ায় তথাকার জমির মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে আশ্রমসংলগ্ন আরও কিছু জমি আশ্রমের জন্য খরিদ করা হইয়াছে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান ভক্তগণের সমাবেশ ও মহোৎসবাদির সময় বহু সহস্র লোককে প্রসাদ বিতরণের জন্য আরও

অনেক জমির প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ৩০।৪০ হাজার লোক সমবেত হয় এবং উত্তরোত্তর এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

১৩৬৩ বাং সনের ১৩ই ফাল্গুন নবনির্ম্মিত এক বিরাট মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট পূর্ব্ব মন্দির হইতে আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মন্দিরের কার্য্য প্রায় তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই মন্দিরের প্ল্যান করা হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য অবসরপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রায় প্রত্যহ রৌদ্র বৃষ্টি আদির সকল উপদ্রব সানন্দে সহ্য করিয়া এই নীরব কর্ম্মী ভগবৎ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভক্তমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। এই প্রকারের একনিষ্ঠ ভগবৎ সেবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

এই আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার অপরাহ্নে মহিলা ভক্তগণের ভগিনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা, বেদবাণী পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীমতী বীণা সেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও গায়িকা, তাহার কীর্ত্তন মনোমুগ্ধকর এবং ভক্তিরস উদ্বোধক।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে এই আশ্রমে গুরুচক্র অধিবেশন হয় এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যায়ও কোনও ভক্তের বাড়ীতে অথবা আশ্রমে ঐ অধিবেশন হয়। তাহাতে গুরুর বন্দনা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত রামায়ণ ও বেদবাণী পাঠ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ ও কীর্ত্তনাদির পর সিন্নি ও ফল প্রসাদ আদি বিতরণ করা হয়।

অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় এই আশ্রমেও খুব ভোরে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পূজা, আরতি, কীর্ত্তন ও সত্যনারায়ণের সেবা প্রত্যহই সম্পন্ন হয়।

এই আশ্রমের বর্ত্তমান সেবাইত চিরকুমার শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল নানা রোগাক্রান্ত হইয়াও বহু বৎসর পাহাড়তলী কৈবল্যধামে ও এই আশ্রমে আপ্রাণ খাটিয়া আশ্রমের সেবা করিয়াছেন। চিরকুমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা, আশ্রমের হিসাবাদি রাখা ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। নিয়মিত পূজক শ্রীপ্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ও ধীর, স্থির, বিনয়ী এবং গম্ভীর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি। আশ্রমের অন্যান্য সেবক শ্রীমান নরেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যশোদা কীর্ত্তনীয়া আদিও নানা প্রকারে আশ্রমের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

### শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের সেবামন্দির
### ডিঙ্গামাণিক জিলা ফরিদপুর।

যে মহাপবিত্র স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বাড়ীরই পূর্ব্বাংশে বহির্ব্বাটীতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ একখানা টালির ছাউনির ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া এই আশ্রম ১৩৪৯ সনের আষাঢ় মাসে গুরুপূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ আশ্রম সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনও বাণী স্মরণ থাকিলে তাহা আমাকে লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করায় ঐ আশ্রমের বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে যে বৎসর আষাঢ় মাসে গুরু পূর্ণিমায় ঠাকুরের আলোকচিত্র ছোট একখানা টালির ঘরে আমরা স্থানীয় কতিপয় আশ্রিতগণ স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ায় বর্ত্তমান মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বিদেশাগত এবং স্থানীয় ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা পরম আনন্দে শেষ হইল। দূরাগত ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর আমাকে ডাকিলেন। আমি চৌমুহানিতে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'গিরীন্দ্র ধীর, স্থির, শান্ত ও কর্ম্মঠ। তোমরা তাহাকেই মোহন্ত কর। আর তোমরা সকলে শাকপাতা টোকাইয়া আনিবা। মেয়েরা পূজার কাজ, রান্না বাড়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করিবে। তোমরা সকলে একবেলা ঠাকুরের প্রসাদ পাইবে! রাত্রিতে সত্যনারায়ণের সিন্নিপ্রসাদ পাইবে। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' আমর স্মরণ হয় শ্রীযুক্ত রায় শুভময় দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মোহন্ত মহারাজ

শ্যামদাদা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার সাহা মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ভক্তের সমক্ষে ঠাকুর ঐ কয়টি কথা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।”

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ আশ্রম সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি বলা আমারও বেশ স্মরণ আছে।

এই উৎসবের পর হইতেই এই স্থানে যেন একটি সুন্দর সেবা মন্দির ও তদানুসঙ্গিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, সেই সম্বন্ধে ভক্তগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে। ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া চৌমুহনীতে এক ভক্তসম্মেলন আহূত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময় চৌমুহনীতে থাকায় দূরবর্ত্তী কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তগণ ঐ সভায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৺বিধুভূষণ বসু, প্রমুখ ভক্তগণের উপস্থিতিতে সভায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য যাহাতে অতি শীঘ্র আরম্ভ হইতে পারে তজ্জন্য চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ সভাতেই কয়েক হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া য়ায। তৎপর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার একনিষ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া এই কাজটী যেন অতি সত্বর সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে কোন বিষয়ে কিছু বলিবেন এই সংবাদ পাইয়া তিনি একটু ভীত হইয়াছিলেন। কারণ যদিও তিনি সময় সময় তৎপূর্ব্বে ঠাকুরের দর্শন ইচ্ছায় ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে কখনও কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া হাত জোড় করিয়া তিনি একটু কাঁপিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত নির্দ্দেশ পাইয়া, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ঐ সময়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কার্য্য সম্পন্ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্ত, রবিবাবু ও আমি ডিঙ্গামাণিক গ্রামে এই সেবা মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানে মিলিত হইয়া মন্দির ও আনুসঙ্গিক গৃহাদি কি ভাবে নির্ম্মিত হইবে তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। ঐ আলোচনা কালে এই মন্দির নির্ম্মাণের সমস্ত খরচ রবিবাবু একাই বহন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিয়া বলি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট কোন কাজই ব্যক্তি বিশেষ সম্পন্ন করুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ এই নির্ম্মাণ কার্য্যে কোন ভক্ত এক পয়সা দিয়াও নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইতে পারে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকল সময়েই ইচ্ছা করেন যে তাঁহার ভক্তগণ সকলে মিলিয়া মিশিয়া যথাসম্ভব সাধ্যানুযায়ী সমবেত প্রচেষ্টায় আনন্দের সহিত যোগদান করুক। আমার এই কথার উপর রবীন্দ্রবাবু কি অন্য কেহ দ্বিরুক্তি না করায়, সকলে মিলিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে ইহাই সাব্যস্ত হইল। স্থির হইল যে, ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত এ, বি, রেলওয়ে কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

তদনুযায়ী বর্ত্তমান মন্দিরের প্লান তিনিই প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী বর্ত্তমান অতি সুরম্য উচ্চ মন্দিরটী এবং আনুসঙ্গিক গৃহাদিও নির্ম্মিত হইয়াছে। পদ্মানদীর তীরস্থ: কোন কোন অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এই মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরেরই পশ্চিম দিকে মাত্র কয়েক হাত দুরে এই আশ্রমের মোহন্ত ও আগন্তুক যাত্রীগণের বাসস্থানের জন্য এবং ভোগ রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য বিস্তীর্ণ বারান্দা বিশিষ্ট "এল্ সেইপের" একখানা একতলা দালানও নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ দালানের এক কামরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ যমজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ঠাকুরর একখানা চিত্রপট বসাইয়া পূজা অর্চ্চনাদি হইতেছে। লক্ষ্মণ ঠাকুরও চিরকুমার অবস্থায় ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিনামেই সকল সময় মত্ত থাকিতেন, কেহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছে শুনিলে তিনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনে সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া অনেক সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। উপরোক্ত জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ের ঘাটের পশ্চিম দিকে বহির্বাটীর প্রাঙ্গন অবস্থিত। তাহারই পশ্চিমে সাবেক কালের পাতলা ইঁটের সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকাটি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ছাদের দুই পার্শ্বে সাবেকী ডোমবিশিষ্ট মন্দির আকারের দুইটী কোঠা ছিল, তাহার উত্তরটীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ পূজিত হইতেন এবং দক্ষিণের কোঠায় একটী দোলমহত ছিল। শেষোক্ত কোঠার উপরের ডোমটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মঞ্চটী এখনও

বিদ্যমান আছে। উত্তরের মন্দিরের সুদৃশ্য কোঠাটি এখনও ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় আছে। ঐ বাড়ীর লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম অবস্থায় ঐ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ঐ জলাশয়ের দক্ষিণ পাড় হইতে প্রশস্ত রাস্তা পূর্ব্বদিকের বিস্তীর্ণ মাঠ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যেখানে বাড়ীর দরজার রাস্তা শেষ হইয়াছে তাহার উত্তর পার্শ্বে সামান্য উঁচু জায়গায় প্রকাণ্ড একটী বহু শাখা বিশিষ্ট অতি সুন্দর অশোক বৃক্ষ ঐ স্থানটিকে ঢাকিয়া অতি মনোরম নিভৃত ধ্যানের স্থানে পরিণত করিয়াছে। ঐ স্থানে গেলে আপনা হইতেই মন ধীর, স্থির ভাবাপন্ন হইতে থাকে। ঠাকুর বাড়ীর লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে ঐ স্থানেই ঠাকুরের পিতা ৺রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে প্রতি বৎসর শ্মশান কালীর পূজা হইত। বর্ত্তমানে সত্যনারায়ণের সেবামন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবের দিন ঐ শ্মশান কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহই ঐ বেদীতে ফুল, জল এবং সন্ধ্যায় ধূপধূনা প্রদীপ আদি দেওয়া হয় এবং প্রতি অমাবস্যায় ঐ স্থানে অন্নভোগ দেওয়া হয়।

ঐ স্থানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী বহুশাখা বিশিষ্ট অতি সুন্দর প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। জানিতে পারিলাম ঠাকুরের পিতা ঐ দুইটী বৃক্ষই স্বহস্তে রোপন করিয়াছিলেন। ঐ দুইটী বৃক্ষ প্রহরীরূপে বাড়ীর দুইধারে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামন্দির ও ঐ বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ স্থানের সামান্য পশ্চিমে একটী পুকুর বর্ত্তমান আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ পুকুরটীকে 'অমৃতকুণ্ড', বাড়ীর ভিতরের পুকুরটীকে

'মায়াকুণ্ড' ও বহির্ব্বাটির প্রকাণ্ড জলাশয়কে 'শ্রীকুণ্ড' নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি।

উক্ত সেবা মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট সোজা সিঁড়ির দুইধারে দুইটী অতি সুন্দর কামিনী ফুলের গাছ শোভা পাইতেছে। তৎপর বৃহৎ প্রাঙ্গণ খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহাতে একখানা সুন্দর নাটমন্দির প্রস্তুত হওয়ার পরিকল্পনা কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে। তাঁহার কৃপায় উহা নির্ম্মিত হইলে উৎসব আদিতে পাঠ কীর্ত্তনাদির সুব্যবস্থা হইতে পারে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানা লম্বা টিনের ঘর আছে—তাহা উৎসবের সময় আগন্তুক যাত্রীদের বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মন্দিরের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান নানা বর্ণের ফুলে সুশোভিত হইয়া থাকে। তাহার দক্ষিণ পার্শে একটি লম্বা পুষ্করিণী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খনন করিয়া মন্দিরের চারিধারের জমি উঁচু করা হইয়াছে।

এই আশ্রমের প্রথম মোহন্ত পরম পূজনীয় ৺গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ১৩৬৬ সনের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত, জীবিত ছিলেন। তিনি ৮৪ বৎসর বয়সেও যে কর্ম্মপটুতা, বিনয় ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশীতি বৎসর বয়স্ক পূজনীয় শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে এই সেবা কার্য্যে সকল সময় সকল বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। ঐ সনের আশ্বিন মাস হইতে তিনি ঐ আশ্রমের মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বর্গীয় মোহন্ত দাদার সহধর্ম্মিনী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরীর শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা

অর্চ্চনায় নিয়মানুবর্ত্তিতার ভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশ্রমে আগন্তুক কোন ভক্তই তাঁহাদের সকলের অনন্যসাধারণ সৌজন্য প্রীতি ও স্নেহে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। পরলোকগত মোহন্ত মহারাজের দুইটী সন্তান, শ্রীমান প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তীর পূজা অর্চ্চনা দর্শন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। শ্রীমান সুনীল বেশ ভাল বেতনের চাকুরী করিতেছিল, কিন্তু বিবেকের তাড়নায় তাহা সানন্দে ত্যাগ করিয়া এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাতেই বাকী জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহার প্রায় সকল সময়ই নামকীর্ত্তন ও ধ্যানধারণার ভাব ভক্তমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। তাহারই উদ্‌যোগে বাগানের ফুলগাছগুলি এবং নানাপ্রকারের তরিতরকারী শাকসব্জী উৎপন্ন হইয়া ঠাকুর সেবায় লাগিয়া থাকে। তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার শেষ বয়সে সেবাশুশ্রূষা করা ও তাহার চাকুরী ছাড়ার অন্যতম কারণ বলিয়া জানিয়াছি। প্রাতে সাড়ে আটটা-নটায় স্নান পর্য্যন্ত সে মৌনী থাকে, তারপর প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজা, আরতি ও কীর্ত্তনে ব্যস্ত থাকে।

এই আশ্রমের নিয়ত সেবায় নিযুক্ত আরও কয়েকজনের মধ্যে শ্রীযুক্তা শিশুবালা দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মামাত ভাই এর বালবিধবা কন্যা। অতি অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় প্রায় সারাজীবনই তিনি পিত্রালয়ে অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীতেই আছেন এবং দিবানিশি তথাকার আশ্রমের সর্ব্বপ্রকার সেবায় ব্যস্ত থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

দেশ বিভাগের পর হইতে বহু হিন্দু নানাস্থানে চলিয়া যাওয়ায় এই সমৃদ্ধিশালী গ্রামখানা নানা কারণে শ্রীভ্রষ্ট ও নির্জ্জন প্রতীয়মান

হইলেও কয়েকজন প্রতিবেশী প্রায়দিনই সন্ধ্যায় ঐ আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেয়।

পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনায়, এই প্রায় জনশূন্য, চারিদিক নদীতে ঘেরা গ্রামের আশ্রমে নানা অভাব হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই আশ্রমবাসী কাহারও মুখে কোনও অভাব বা নৈরাশ্যের কথা কখনও শুনিতে পাই নাই। তাঁহাদিগকে ঠাকুর যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন। ঠাকুরও তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শাক তরকারী ডাল যাহা যখন জোটে, তাহা দিয়া ভোগ দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা যেন কোন কারণেই বিচলিত না হন জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রসাদপ্রার্থী মাত্রই কিছু না কিছু প্রসাদ পাইয়া প্রত্যহই পরিতৃপ্ত হয়। এই স্থানের মুসলমানগণ এবং কার্ত্তিকপুরের প্রসিদ্ধ স্থানীয় মুসলমান জমিদার বংশের লোকেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আশ্রমের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ মুসলমান ভক্ত ৺চেরাগালী ভাই এই গ্রামে তাঁহার নিজ বাড়ীতে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও ছোটভাই ঠাকুরেরই আশ্রিত এবং এখনও তাহারা ঐ আশ্রম রক্ষা করিতেছে।

## শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিমন্দির ও আশ্রম

যে স্থানে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা চৌমুহনী হাটের দক্ষিণদিকের মাঠের অংশ বিশেষ। এই প্রসিদ্ধ হাট নোয়াখালী

জিলার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। চৌমুহনী রেল ষ্টেশন ও বাস (Bus) আদি চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা এই আশ্রমের অতি নিকটবর্ত্তী।

১৩৪৯ সনের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় শ্রীমান উপেন্দ্র কুমার সাহাকে জানাইলেন যে তাঁহার কিছুদিন খুব নিরিবিলি থাকার প্রয়োজন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমান উপেন্দ্র তাঁহাকে বলিল যে চৌমুহনীতে তাহাদের একটি বাঙ্গলো খালি পড়িয়া আছে। তিনি দয়া করিয়া তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা অবিলম্বে তথায় তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ঠাকুর সম্মতি জানাইলে উপেন তৎক্ষণাৎ পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা নরেন ভূঞাকে অবিলম্বে বাঙ্গলোটির থাকার কামরার সঙ্গে স্যানিটারি পায়খানা আদি প্রস্তুত করাইয়া এবং টিউবওয়েল বসাইয়া সংবাদ দিতে লিখিল। নরেন ৩।৪ দিনের মধ্যেই আবশ্যকীয় সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া সংবাদ দিলে, উপেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

সেই সময় হইতে প্রায় সাত বৎসর, অর্থাৎ ১৩৫৬ বাং সনের ১৮ই বৈশাখ তাঁহার তিরোধানের দিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তিনি ঐ স্থানেই বাস করিয়াছেন। অবশ্য অল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি এ জেলার ও অন্যান্য জেলার কোন কোন স্থানেও মাঝে মাঝে যাতায়াত করিয়াছেন।

এই স্থানে থাকাকালে ঠাকুর ভোরে উঠিয়া হাতমুখ ধোওয়ার পর কিছুকাল ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেন। তৎপর একখানা বাংলা সংবাদপত্র পড়িতেন। কিন্তু কেহ তাঁহার দর্শন অথবা উপদেশবাণী

শ্রবণ করিবার জন্য আসিলে অনতিবিলম্বে ঐ পত্রিকা পড়া বন্ধ করিয়া তাহাকে তাহার প্রার্থনানুযায়ী উপদেশ দিতেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শুনিতে যখনই উৎসুক হইয়া আসিয়াছি তখনই তাঁহাকে প্রণাম করা মাত্র হাতের পত্রিকার কাগজখানা ফেলিয়া রাখিয়া অনবরত আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে থাকিতেন। আমরা অত্যন্ত নিম্নাধিকারী বলিয়া তাহা প্রায় কিছুই না বুঝিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম, কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতাম এবং ঐ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না।

নোয়াখালী সহর ঐ স্থান হইতে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত থাকায় এবং উভয় স্থানের মধ্যে রেলগাড়ীর চলাচল থাকায় আমরা দুই ভাই প্রতি রবিবারে এবং যে কোনও কারণে অফিস বন্ধ হইলেই যথাসাধ্য ঠাকুরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ছাড়িতামনা। তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ ছাড়াও তাঁহার অতি স্নিগ্ধ পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীচরণ স্পর্শ করার প্রবল ইচ্ছা আমাদিগকে সবেগে টানিয়া নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত।

আমাদিগকে সৎপথে চালিত করার জন্যও আমাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য সকল সময় খুব অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি এত বেশী কথা বলিতেন যে, আমাদের প্রাণে অত্যন্ত ব্যাথা লাগিত। কিন্তু তাঁহার অনর্গল কথা বলিতে থাকা অবস্থায় ঐ কথা বন্ধ করার জন্য ইঙ্গিত করিতেও সাহস করিতাম না।

ঐ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরান্না স্নেহাস্পদ নরেন ভায়ার দ্বারাই প্রায় দিনই সুসম্পন্ন হইত। শ্রীমান উপেন ও নরেন তাহাদের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা পরিচালনের ভার কর্ম্মচারীগণের উপর ন্যাস্ত করিয়া প্রায় সকল সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঐ বাঙ্গলোতেই অবস্থান করিত। রাত্রেও তাহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন তথায় থাকিত। ঐ সময় তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে নানাপ্রকারের ব্যঞ্জন ও মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীও শিখিয়াছিল। ঠাকুর উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রকেই কিছু না কিছু প্রসাদ দেওয়ার জন্য সকল সময় অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নিজে একপ্রকার অনাহারী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ তিনি লবণ না দিয়া তরীতরকারী সিদ্ধ অতি সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম যখন এই বাঙ্গলোতে আসিয়াছিলেন তখন ঐ স্থানে ফুল গাছ আদি প্রায় কিছুই ছিলনা। তাঁহার অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ঐ আশ্রমের আয়তন ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহা নানা জাতীয় ফুল ও ফল বৃক্ষে সুশোভিত হইতে লাগিল।

সময় সময় ঐ বাঙ্গলোর কম্পাউণ্ডের দ্বার বন্ধ রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ নিষিদ্ধ বলিয়া সেবকেরা প্রচার করিলেও বহুদূর হইতে নানাজাতীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কাহাকেও দর্শনে বঞ্চিত করিতেন না। কেহ কেহ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইত এবং তাঁহার সুমধুর বচনে পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

## শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহত্যাগ

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ আমি পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম উৎসব সমাপনান্তে ২রা বৈশাখ সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনেচ্ছায় ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন বিলনিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর ঐ সময় অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার আশ্রিত আমাদের সহৃদয় বন্ধু রায়সাহেব শচীন্দ্র মালাকার মহাশয়দের তথাকার বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং আমরাও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার এই দেহ নিয়া আর লোকালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমাকে গঙ্গার ধারে কোনও জঙ্গলে রাখিয়া আসিতে পারেন? স্বভাবতঃ খুবই অগভীর (Superficial) আমি, এই কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝিলাম না। তিনি ঐ সময় ঐ ভাবের আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্পষ্ট মনে না থাকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলাম বটে, কিন্তু কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কথাগুলি আমার মনের উপর বিশেষ কোনও রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়াও মনে পড়ে না।

ঐ স্থান হইতে আমরা বিদায় গ্রহণকালে ঠাকুর আমাকে বলিলেন যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য আমি যেন উপেন

ও নরেনকে খবর দিই। আমি একজন খুব বিশ্বস্ত বন্ধুর মারফতে ঐ সংবাদ তাহাদিগকে দিলে শ্রীমান উপেন আসিয়া ঠাকুরকে তথা হইতে চৌমুহনী লইয়া যায়।

যতদূর মনে হয় তারপরের রবিবারেও ঠাকুর সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার চিরন্তন প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ও অমৃতবাণী শ্রবণে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং প্রাতে প্রায় ১১টার সময় অতি স্নেহভরে তিনি প্রসাদ পাওয়ার জন্য যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ দিন, কি ২রা বৈশাখ, বিলনিয়ায় তাঁহার শারিরীক অবস্থাদি দেখিয়া ঘুনাক্ষরেও অনুভব করিতে পারি নাই যে সাত দিন পরে আমাদের এক অচিন্ত্যনীয় ও অকল্পনীয় হৃদয় বিদারক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। সে দিন শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বিদায় গ্রহণকালেও তিনি চিরন্তন মৃদুমধুর হাস্যপূর্ণ বদনে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

১৮ই বৈশাখ রবিবার ভোরের গাড়ীতে আমি ও আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত চৌমুহনী আশ্রমে আসিয়া শ্রীমান উপেন ও নরেনের নিকট জানিতে পারিলাম যে ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি যে কামরায় ছিলেন তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন এবং তাঁহার পরিধানের কৌপীন, বহির্ব্বাস, কোমরের তাগা আদি কিছুই নাই। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ভয়বিহ্বলচিত্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা সত্বেও তিনি কিছুই না বলায় আমরা উদ্বিগ্ন হইলাম। তাঁহার নানাপ্রকারের অসুস্থতা বহুবার দেখিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হয়ত দুই তিন ঘণ্টা পরেই তিনি আবার উঠিয়া বসিয়া

আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলাপ করিবেন। এই ভরসাতেই মনকে অনেকটা সান্ত্বনা দিলাম এবং সেই দিন প্রাতে অপর কোন ব্যক্তি যেন ঐ কামরাতে প্রবেশ না করে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া সেবাকারী ২।১ জন ছাড়া আমরা সকলে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। কিছুকাল পরে বরিশাল ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার আরও পাঁচ ছয় জন সঙ্গী সহ আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ বিধায় আমি তাঁহাদিগকে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম।

বরিশালের ভদ্রলোকদিগের নিকট জানিতে পারিলাম ম্যানেজার বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত এবং কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তিনি নানা প্রকারের আবোল তাবোল কথা কিছুদিন যাবৎ বলিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে হয়ত তাঁহার এই আকস্মিক বিকারের প্রতিকার হইবে মনে করিয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ঐখানে নিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে এইরূপ অসুস্থ হন, আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্বাভাবিক ভাবেই আলাপাদি করেন। সম্ভবতঃ বিকাল বেলায়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। তখন একটু দূরে সরিয়া ঐ বাঙ্গলোর বারান্দার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বসিয়া ঐ ভদ্রলোকগণ কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি যথাসাধ্য কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিনি যন্ত্রনায় বিছানার উপর চরকির মত চারিদিকে ঘুরিতেছেন। ইহাতে আমি অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারই প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র মনে

মনে জপ করিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। একটু পরেই তিনি আমার হাতখানা ধরিয়া আস্তে সরাইয়া দিলেন। অতি সামান্য একটু অপেক্ষা করিয়া আবার আমি ঐভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম, তিনি আবার হাতখানা ধরিয়া ঐভাবে সরাইয়া দিলেন। তারপর আর আমি হাত বুলাইতে সাহস করিলাম না। কেমন একটা ভীষণ আতঙ্কে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরে বারান্দায় আসিয়া শ্রীমান উপেনের কথা শুনিয়া ঐ আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইল। উপেন বলিল যে পূর্ব্বরাত্রে সে যখন ঠাকুরের বিছানায় মশারীর নীচে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ঠাকুর বলিলেন, তিনি দেখিলেন সূর্য্য ও চন্দ্র রথ নিয়া তাঁহাকে নিতে আসিয়াছেন। উপেন ইহাও বলিল যে, "দাদা অন্যান্য বার অসুস্থ হইলেও দেখিয়াছেন ত প্রায় এগারটার সময় আপনাদিগকে প্রসাদ পাইতে যাইত বলিতেন, আজ ত সেরূপ কিছুই বলিতেছেন না।" আমি তাহাতে সায় দিয়া বলিলাম, কলিকাতায় ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত দাদাকে টেলিগ্রাম করা সঙ্গত। উপেন অত্যন্ত ভয়বিহ্বল চিত্তে নীরব হইয়া রহিল। একটু পূর্ব্বে আমি ঘরের বারান্দায় থাকাকালে ঠাকুর উপেনকে ডুস্ দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া ডুস্ দিতে সাহস পাইতেছিলনা। এমন সময় ঠাকুর একটু জোর করিয়া বলিলেন, "ডুস্ দেয় না কেন ?" ইহাতে উপেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন ডুস্ দিতে ইতস্ততঃ করিওনা।" এই কথার পর ডাক্তার ডুস্ দিল এবং তাহাতে জলের মত কিছুটা মল বাহির হইয়া গেল।

বেলা প্রায় এগারটার সময় উপেন বলিল, "নরেনদার গদীতে আজ ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আপনারা তাড়াতাড়ী আহার করিয়া আস্থন। আমি ও অখিল ( উপেনের পিসতুত ভাই ) এখানে থাকিব।" আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া খুব তাড়াতাড়ী অতি নিকটস্থ নরেনের গদীতে আহার করিয়া আবার ঠাকুরের নিকটে আসিতেছি, এমন সময় বরিশালের ভদ্রলোকেরা যাঁহারা একটু পূর্ব্বে আহার করিয়া সেই গদীতে অন্য কামরায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা আমাকে বলিলেন "প্রাতে আপনার কথা শুনিয়া ম্যানেজার বাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ ঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।" ইই কথা শুনিয়া আমি মাত্র তাহাদের নিকট যাইয়া বসিয়াছি এমন সময় চৌমুহনীর ব্যবসায়ী শ্রীমান সূর্য্য ভৌমিক অতি সন্ত্রস্তভাবে আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "দাদা দাদা দেখিয়া যান, ঠাকুর কি করিতেছেন ?" এই কথা বলিয়া সে আবার ফিরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে ভয়ানক বিপর্য্যয় আসন্ন মনে করিয়া আমি ও দাদা তাহার পিছনে ছুটিয়া গেলাম। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তিনি উত্তর শিয়র হইয়া লম্বা হইয়া চক্ষু বুঝিয়া স্থির ভাবে শুইয়া আছেন। আমি তাঁহার বুকে হাত দিলাম এবং একটু গরম বোধ করিয়া বলিলাম "এখনও প্রাণ আছে।" ছুই মিনিট পরেই একজন ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল যে হৃদযন্ত্রের অতি মৃত্নগতি বোধ করা যাইতেছে। কিন্তু বাঁচিবার কোনও আশা নাই। আমি এই অবস্থায়ও মনে করিতেছিলাম যে ঠাকুর নিশ্চয়ই আবার উঠিয়া বসিবেন। ইহার মিনিট পাঁচেক পরেই উমেশচন্দ্র চৌধুরী এম, বি, ঠাকুরের হৃদযন্ত্রাদি

পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনারা অনর্থক আশা করিতেছেন। ঠাকুর দেহে নাই।" এই কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরি শোকোচ্ছ্বাস যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। কিন্তু একটু পরেই পরম দয়াল ঠাকুরের কৃপায় মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরত নিজেই অনেকবার বলিয়াছেন যে তিনি সকল সময় আমাদের সঙ্গেই আছেন। সুতরাং দেহত্যাগে আমাদের বিশেষ দুঃখের কি কারণ আছে, তিনিত অনেক সময় বলিতেন, "আমার দেহটাকে নিয়া কেন টানাটানি করিতে চায়। আমি ত সকলের সঙ্গেই আছি।" এই রকম নানা সময়ে তাঁহার নানা উক্তি ও আচরণাদি মনে হইয়া মন স্বতঃই সান্ত্বনা পাইতে লাগিল। নানাস্থানে টেলিগ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। আমি তাড়াতাড়ী নোয়াখালী শহরে গিয়া সকলকে চৌমুহনী আশ্রমে আসিতে বলিয়া পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিলাম।

ঐ দিন ফেণীতে পরলোকগত ৺যামিনী কুমার সাহা মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব করিতেছিল। তথায় শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবের পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তথায় ভক্তগণ এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া বাসে, ট্রেনে সন্ধ্যার কিছুপরেই চৌমুহনী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীমান উপেনের নিকট পরে জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা শ্রীদেহ ত্যাগের পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর বলিতেছিলেন যে, গঙ্গার ধারে কিংবা কোন জঙ্গলে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে পারিলে ভাল

হয়। ঠিক এই ভাবের কথা ঠাকুর ২রা বৈশাখ বিলনিয়াতে আমাকে বলিয়াছিলেন। দেহত্যাগের দুই তিন দিন পূর্ব্বে উপেন ও নরেনকে তিনি খুব ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা মনে যথেষ্ট ব্যথা পাইয়াছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ তৎপরদিনই তিনি তাহাদিগকে মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া, এমন কি চিবুক ধরিয়াও এমন স্নেহমাখা বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন যে, তাহারা পূর্ব্বের ভৎর্সনার ব্যাথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া সাময়িকভাবে হইলেও পরমানন্দে ডুবিয়াছিল। তখন তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই অচিন্ত্যনীয় স্নেহবর্ষণের পরেই তিনি আকস্মিকভাবে অন্তর্দ্ধান করিবেন।

উপেন পরে আমাকে ইহাও বলিয়াছে যে সেদিন আমরা আহার করিতে যাওয়ার পর ঠাকুর অস্ফুট স্বরে দুই তিন বার বলিয়াছিলেন "ঘুমাই, ঘুমাই।" তাহাতে তাঁহার ঘুমাইবার ইচ্ছা হইয়াছে মনে করিয়া উপেন অবিলম্বে ঘুম হওয়ার বড়ি আনাইয়া খলে মাড়িতেছিল, এমন সময় সূর্য্য ভৌমিক ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া একটু জোরে বলিয়া উঠিল "দেখুন ঠাকুর কি রকম করেন।" ঐ শব্দে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া উপেন বিরক্তির ভাবে সূর্য্যকে জোরে ধাক্কা মারিয়া বিছানা হইতে ফেলিয়া দিল। সে অতি ব্যস্তভাবে দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে ডাকিয়া আনিল এই বিষয় পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে আমি কখনও ভাবি নাই অত শীঘ্র আমাদের এই অবস্থায় ফেলিয়া ঠাকুর চলিয়া যাইবেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বেই তিনি খুব

অসুস্থ অবস্থায় অতি মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন, "ইচ্ছা না হইলে ত মৃত্যু হইবে না।" একথা স্মরণ করিয়া মনে করিতাম যে তাঁহার শ্রীদেহ-ত্যাগের অনেক গৌণ আছে। এই কারণেই প্রথমতঃ খুবই বিষণ্ণ হইয়াছিলাম।

এই সম্পর্কে একটি বৈষ্ণবভক্তের কথা অনেক সময় মনে পড়ে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরের দিন ৺সীতানাথ বৈষ্ণব আমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "দাদা! আপনার বিষণ্ণ হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই। দেখিতে পাইবেন যে প্রকট অবস্থা অপেক্ষা অপ্রকট অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদিগকে অনেক বেশী শক্তি দিবেন।" পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিতেছি তাহার কথা খুবই সত্য। তিনি দেহে নাই বটে, কিন্তু সকল সময়, সকল অবস্থায় শান্তি দিতেছেন এবং কোন অভাবই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। ধৈর্য্যের অভাবেই আমরা সময় সময় অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে, ঠাকুর বাঙ্গলোর যে কক্ষে বাস করিতেন সেই কক্ষেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইবে। কলিকাতা এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভক্তগণ যেন উপস্থিত হইতে পারেন তজ্জন্য অন্ততঃপক্ষে একদিন শ্রীদেহ তদবস্থায় রাখিয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আরও হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। পরে জনসংখ্যা এত অধিক হইল যে, বেশ একটু উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর উঠাইয়া তাঁহার শ্রীদেহ দর্শনের সুযোগ সকলকে

দেওয়া হইল, রাত্রি প্রায় দেড়টার পর শ্রীদেহ যথারীতি স্নান করাইয়া অগুরু আদি নানা দ্রব্যসম্ভারে দেহ সিক্ত করা হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারই কৃপায় চারি হাত দৈর্ঘ্য, চারি হাত প্রস্থ ও চারি হাত গভীরতা বিশিষ্ট একটি গর্ত্ত করিয়া এবং তাহার চতুর্দ্দিক ও নিম্নভাগ ইঁট, সুরকী ও সিমেণ্ট ইত্যাদি দ্বারা বেশ শক্ত করিয়া বাঁধাইয়া ঠাকুর যে খাটে, যে শয্যায় এবং যে মশারীর নীচে শয়ন করিতেন সেই সব জিনিষ সহ এবং তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি জিনিষ পাশে রাখিয়া ভক্ত-চিরবাঞ্ছিত পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হইল। ভক্তগণ চারিদিকে শোকাশ্রু অপর দিকে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হরিনাম কীর্ত্তন ও মুহুর্মুহু উলুধ্বনির মধ্যে সেই পরম পবিত্র, পরমবাঞ্ছিত, চির সেবিত দেহ সমাধিস্থ করিল। ঠাকুর ভক্তগণের লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন তাহা হইতে কখনই অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না।

দেহরক্ষার একাদশ দিবসে ভক্তগণ সমাধিক্ষেত্রে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। নামযজ্ঞ, পূজা, আরতি, ভোগরাগাদি মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। হিন্দু, মুসলমান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাকিস্তান সরকার চাউল, তৈল, চিনি ইত্যাদি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি কণ্ট্রোল রেইটে সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমাধি-

স্থানের উপর এমনভাবে টাকা পয়সা আদি নিক্ষেপ করিয়াছিল যে সময় সময় টাকা পয়সা বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। মহোৎসবে ঐ বিরাট জনতার প্রত্যেক ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীনামকীর্ত্তনও বহুপ্রহর অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল।

তিনি যে গৃহে ছিলেন তাহা যথাসম্ভব তদবস্থায় রাখাই সকলের ইপ্সিত ছিল। কিন্তু আলোচনার পর উপস্থিত ভক্তমাত্রই নূতন একটি সুরম্য ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া সাব্যস্ত করিল, কারণ ক্ষয়শীল টালির ছাদের ও বাঁশের বেড়ার ঘর খুব বেশীদিন ঠিক অবস্থায় রাখা অসম্ভব।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন সেন মহাশয়ের দ্বারা সুচিন্তিত একটি সুন্দর প্ল্যান ( নক্সা ) প্রস্তুত করাইয়া বর্ত্তমান সুরম্য মন্দিরটি নির্ম্মিত হইল। ঐ মন্দিরটির চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া খোলা প্রশস্ত বারান্দা সমাধিস্থান প্রদক্ষিণ করার বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়াছে। সম্মুখের অর্থাৎ দক্ষিণদিকের বারান্দাটি এমনই প্রশস্ত যে, প্রায় একশত লোক তথায় বসিয়া পরমানন্দে কীর্ত্তনাদি করিতে পারে। তথায় প্রত্যহই সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় পূজা আরতি আদির সময় কীর্ত্তন হইয়া থাকে। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে সমাধিস্থানের উপরে চারফুট উচ্চ সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত বাঁধান স্থানের উপরিভাগ বিভিন্ন সময়ে নানা সুন্দর বর্ণের কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। ঐ স্থান প্রথম দিনের সমাধিস্থান অপেক্ষা অনেক বড় করা হইয়াছে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার



এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমান উপেন্দ্রের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, পরবর্ত্তী সময়ে রাজমিস্ত্রীগণ সমাধিস্থানের উপরিভাগের নির্ম্মাণ কার্য্য করার সময় যখন নিম্নস্থ বাঁধান স্থান একটু ফাঁক হইয়াছিল তখন ঐ ফাঁক দিয়া ভিতর হইতে অতি মধুর সুঘ্রাণ পাওয়ায় আর ঐ স্থানে কাজ করা সঙ্গত হইবেনা মনে করিয়া উপেনকে জানাইয়াছিল। সেও আসিয়া ঐরূপ অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাওয়ায় তাড়াতাড়ী ঐ ফাঁকা স্থান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছিল এবং তদনুযায়ী ঐ স্থান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

মন্দিরের সম্মুখে "জয় গোবিন্দ" কথাটি এমন সুন্দর ভাবে ও বৃহদাকারে লেখান হইয়াছে যে, তাহা বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয় এবং ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে, তিনি যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন সেই অতি পবিত্র মধুর আশীর্ব্বাদবাণীর স্মৃতি জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দে আপ্লুত করে।

এই মন্দিরের সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর একখানা নাটমন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতেও তারকব্রহ্ম নাম ও নানা শাস্ত্রবাক্য অতি সুন্দরভাবে লেখা হওয়ায়, উহার সৌষ্ঠব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠিক ঐ প্রকারের সুন্দর নাটমন্দির বাংলা দেশে অতি বিরল।

উপরোক্ত মন্দির ও নাটমন্দিরের পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ পুষ্পোদ্যান আছে। সেইগুলি বহু গোলাপ, জবা, গন্ধরাজ, পদ্ম আদি নানাপ্রকার ফুলে সুশোভিত থাকে।

নাটমন্দিরের দক্ষিণে বৃহৎ প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত দুইধারে দুই সারি বেলফুল গাছ এবং তাহার পার্শ্বে অন্যান্য ফল গাছ ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছে। এই প্রবেশ দ্বারের পূর্ব্বপার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ যাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বে একটু দূরে টিউবওয়েল ও অনেকগুলি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ( পায়খানা ) তৈরী হইয়াছে।

সমাধি মন্দিরের উত্তরদিকেও বৃহৎ প্রাঙ্গন বিদ্যমান, তাহার পূর্ব্বধারে মহোৎসব আদির ভোগরন্ধনের ঘর এবং পশ্চিম ও উত্তর ধার ঘিরিয়া কতগুলি টিনের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের একখানি ঘরে সমাধি মন্দির সম্পর্কীয় অফিসের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার ও মোহন্ত মহারাজ তথায় গেলে তাঁহার বাসের সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর এই আশ্রমের সেবার জন্য কয়েকজন ভক্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমান স্বদেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রথম বৎসর অতি সুষ্ঠভাবে এই আশ্রমের সেবাইতের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে। তাহারই চেষ্টায় ফুলের বাগানআদি ক্রমশই উন্নতি লাভ করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য সে নিজহস্তে মিষ্টি দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিয়া সেবায় দিত। যাহাতে আগন্তুকমাত্রই বেশ আনন্দের সহিত আশ্রমে থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিত, কীর্ত্তনাদিও তাহার উৎসাহে সুসম্পন্ন হইত। কয়েক বৎসর পর মোহন্ত মহারাজের আদেশে সে পাহাড়তলী 'শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে' চলিয়া যায় এবং তথায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেবাব্রতে নিযুক্ত আছে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী সেবাইত নিযুক্ত হওয়া অবধি আপ্রাণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যসহকারে ঐ আশ্রমের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিছু না কিছু প্রসাদ না পাইয়া কেহ আশ্রম হইতে ফিরিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। সমাধি আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া একটি বালক কীর্ত্তন এবং যাত্রীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে।

শ্রীমান উপেন্দ্র কুমার সাহার প্রাণ এই সমাধি আশ্রমেই পড়িয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে তাহার সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ের নানাপ্রকারের কার্য্য ছাড়িয়া প্রায় সকল সময়েই এই আশ্রমেই পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব তাহারই অনন্য চেষ্টায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে, অতি শীঘ্রই বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চপ্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তথাকার অক্লান্ত কর্ম্মী, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার সাহাও আশ্রমের উন্নতিকল্পে পূর্ণোদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। আশ্রমের ম্যানেজার বিনা বেতনে, স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীমান দীনবন্ধু সাহা তাহার ব্যবসায়ের কার্য্য সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া সকল সময়ে আশ্রমের কার্য্যে ব্রতী আছে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের ও চৌমুহনীর বহু ভক্তের প্রাণ এই আশ্রমেই পড়িয়া থাকায়, ইহা প্রকৃতই আনন্দধামে পরিণত হইয়াছে।

চৌমুহনী কলেজের বহু ছাত্র ও চৌমুহনীবাসী অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বিকালে ও সন্ধ্যায় আশ্রম উদ্যানে ও নাটমন্দিরে বেড়াইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

এই আশ্রমে কোন অর্থাভাবের কথা কখনও শোনা যায় নাই। কর্ম্মকর্ত্তাগণ বলেন যে,—শ্রীশ্রীঠাকুরই সকল সময়ে সকল অভাব পূরণ করিতেছেন। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। তাঁহার কৃপায় প্রতি বৎসর ৪০।৫০ হাজার লোক সমাধি উৎসবে ৩।৪ দিন ব্যাপিয়া কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন বৎসরই উৎসবের পর অর্থের ঘাটতি দৃষ্ট হয় নাই।

নানাজাতীয় ফল ও ফুলে শোভিত এই আশ্রমটি বস্তুতঃই মনোমুগ্ধকর এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শক্তি আহরণের প্রকৃষ্ট স্থান সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত হইয়া ভক্তমাত্রকেই এখানে পরম আনন্দে আপ্লুত করে।

## চিতোরের আশ্রম

উল্লিখিত আশ্রম চারিটি ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজপুতানায় অবস্থানকালে চিতোরেও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে সিমলা হইতে আমাকে লিখিত কয়েকখানা পত্রেও তিনি এই আশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৩১ ইং সনের ১২ই আগষ্ট ( অর্থাৎ ১৩৩৮ বাং সনের শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে ) শ্রীযুত যামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ( ৬২ নং সোনরপুরা, বেনারস সিটি ) হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে লিখিয়াছিলেন—"চিতোরের আশ্রমে যাওয়ার জন্য গুরুর নিষেধ হইয়াছে বলিয়া সেখানে যাওয়া হইল না।" কিন্তু ঐ আশ্রমের বিষয় বিস্তারিত ভাবে তিনি কখনও কিছু বলেন নাই এবং

আমি নিজেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। সম্প্রতি ঐ আশ্রম দেখার ইচ্ছা মনে জাগিলেও, নানালোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা চিতোরের কোন অংশে প্রতিষ্ঠিত না জানিতে পারায় তাহা দেখিবার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

## তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইতিপূর্ব্বে যাঁহার আচরণ ও অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাকে যাঁহারা কখনও দেখেন নাই অথবা তাঁহার সঙ্গ করিবার সুযোগ পান নাই এইরূপ পাঠক পাঠিকাগণের তাঁহার জীবনী সম্পর্কে কিছু জানিতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহার সমস্ত জীবনই কুহেলিকাপূর্ণ এবং যিনি বাল্যকাল হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই সকল সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার জীবনী লেখা আমার ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে দূরে থাকুক, অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষীদিগের পক্ষেও তাহা সম্পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে কোন কোন বিজ্ঞ মহাপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার জীবনী লিখিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। তত্রাচ পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব কালক্রমানুসারে ( Chronologically ) তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত ডিঙ্গা-মানিক গ্রামে ১২৬৬ বাং সনের ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দশমীতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাধনক্ষেত্র এখনও তাঁহাদের বাড়ীর পূর্ব্বধারে বিদ্যমান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী কমলাদেবী অতিশয় সরলা সদাশয়া এবং রন্ধনকার্য্যে অতি নিপুনা ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। নিজের সুখ সুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পরের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁহার সকল সময়ে লক্ষ্য ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যমজ কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ ঠাকুরও কতকটা তাঁহারই ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সরলমনা, কষ্টসহিষ্ণু, পরোপকারী ও প্রেম, ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। হরিনাম শ্রবণে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তিনি ভাবে গদগদ হইয়া যাইতেন এবং প্রায়ই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি চিরকুমার ছিলেন। পীড়িতের সেবা ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম্ম। উৎসবে কি ব্যসনে প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে তিনি ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহাকে স্থানীয় লোকেরা "হরিবলা ঠাকুর" বলিত। ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সে তিনি কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু দিবসে ঠাকুর কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে ফিরিয়া তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন "লক্ষ্মণকে বিশ্বেশ্বরের পার্শ্বে দেখিলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বাল্যকালে মৃত্তিকার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাদের পূজা করিতেন এবং নিবিষ্টচিত্তে রামায়ণ গান শুনিতেন। তিনি শ্যামা-সঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং তাহা শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। কখনও কখনও নিজেও এক আধটু গান করিতেন। তিনি অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত ছিলেন। সংসারের বহু কষ্টসাধ্য কাজ তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে করিয়া যাইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স যখন ৮ বৎসর তখন তাঁহার পিতা রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অকস্মাৎ স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পরে তাঁহার গুরুদেব বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য্য মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় রোগাক্রান্ত হইলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বালক রামকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বাল্যকালে তিনি ঠাকুরের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী কমলাদেবী উক্ত গুরুদেবের রোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব তাঁহাদের সমক্ষে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ঠাকুর স্বপ্নে অথবা কোন অপ্রকাশ্য অতীন্দ্রিয় উপায়ে সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন, এবং ১২ বৎসর বয়সেই সকলের অলক্ষিতে একদিন গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ইহার পর প্রায় দশ, বার বৎসর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঐ সময় তিনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন এবং কি করিতেন—তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এমন কোন লোকের নাম এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। ঐ সময়ের কথা সময় সময় কথা প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

ঐ সময়ের কথা ঠাকুর নিজমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী "হিমাদ্রি" পত্রিকায় নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

তখন আসাম-বেঙ্গল রেল লাইন ছিল না, লোকে পদব্রজে বা নৌকায় আসাম অঞ্চলের তীর্থদর্শনে যাতায়াত করিত। হাঁটিয়া যাইবার পথ ছিল গহন বন ও গিরিসংকটের মধ্য দিয়া। শ্বাপদসংকুল এইসব পথে যাতায়াত যেমন কষ্টকর তেমন বিপদজনক ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য, মনবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার বলে সেই দুর্গম পথে হাঁটিয়া বহুদিনে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র জপ করিতেছেন, হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন মন্দিরের বাহির হইতে রাম রাম বলিয়া ডাকিতেছে। ঠাকুর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক তেজময় মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি চিনিতে পারিলেন, এই মহাপুরুষ তাঁহাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ পদপ্রান্তে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন,—মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। ঠাকুর তখন নিঃসন্দেহে বুঝিলেন ইনিই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্তা।

ঠাকুর তাঁহার গুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জটা, উদর স্ফীত, নাভীদেশ গভীর, বাহুদ্বয় দীর্ঘ আজানু লম্বিত, কপাল প্রশস্ত, তিনি যেন শান্তি ও দয়ার প্রতিমুর্ত্তি। ঠাকুর বলিয়াছেন তিনি "অনন্ত দেব" নামে পরিচিত।

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুদেব সম্পর্কে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে কখনও ইচ্ছা করি নাই, তাঁহার যে সকল বিভূতি আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সর্ব্বশক্তিমান

ভগবানই তাঁহার গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেন, এবং গুরুদেব ঠাকুরকে তাঁহার সমস্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ এইরূপ কথা আমাদের কখনও মনেই হইত না।

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীশঙ্করনাথ রায় তাঁহার "ভারতের সাধক" নামক গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে 'রাম ঠাকুর' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন— "ঠাকুরের অধ্যাত্ম জীবনের মহাশিল্পী, তাঁহার ঐ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান গুরুদেবের প্রকৃত পরিচয় আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তিনি নিজে কখনো তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, শিব কল্প গুরুর প্রকৃত পরিচয়টি গোপন রাখিয়া নানা সময়ে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন অনঙ্গদেব নামে। অনঙ্গদেব, অর্থাৎ অঙ্গ নাই যাঁহার—বিদেহী সত্তারূপে সর্ব্বভূতে যিনি বিরাতিতে। গুরুর এই সার্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক পরিচয়টিকেই এই নামকরণের মধ্য দিয়া ঠাকুর প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। "ভগবানের স্বরূপ শক্তি বলিয়াও কখনো কখনো স্বীয় গুরুর কথা শ্রদ্ধাভরে তিনি উল্লেখ করিতেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমবার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গে হিমালয়ের বহু অগম্য স্থানে গমন করিয়া ধ্যানরত বহু সাধু, মহাত্মাদের দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং নানা ফুল ফলে সুশোভিত বহু উদ্যান পরিভ্রমন করিয়াছিলেন।

একটি আশ্রম সম্বন্ধে তিনি আমার সমক্ষেও বলিয়াছিলেন যে, ব্যঘ্র, ভল্লুক আদি নানা হিংস্র জন্তু এবং হরিণাদি নিরীহ প্রাণী সেই আশ্রমে হিংসা শূন্য হইয়া পরষ্পর মিলিয়া মিসিয়া একসঙ্গে সুহৃদ ভাবে

বাস করিতেছিল। আর একটি আশ্রমের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন যে সেখানে কয়েকজন অতি উন্নতকায় মহাপুরুষ গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাঁহারা এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর দণ্ডায়মান অবস্থায় ও তাঁহাদের উচ্চতায় সমকক্ষ হন নাই, ঐ সকল মহাপুরুষদের জন্য ফলমূলাদি আহরণ করিয়া কিছু দিন ঠাকুর তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও কোনও কথা তাঁহার সহিত বলেন নাই, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সকল সময় একই ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহারা কৃপা করিয়া উভয়হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুইবার নিরুদ্দেশ হইয়া কেবল পাহাড় পর্ব্বতে নহে, নানা তীর্থস্থানে এবং সমতল ভূমিতে ও গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভ্রমন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু তাঁহার মুখে শুনিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত পরে স্মরণশক্তির আশ্রয় নিয়া কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কি শক্তি আহরন করিয়া প্রথম দশ বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর দেশে ফিরিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিত আভাস তৎকালীন ফেনী মহোকুমার হাকিম সুপণ্ডিত, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'আমার জীবন' গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে ঐ সম্পর্কে আর কিছু লিখিতে নিবৃত্ত হইলাম।

যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর অসীম শক্তি আহরন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহার বাক্যে বা আচরণে কোনদিন তাহা প্রকাশ পাইত না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, তখনও সেইরূপ সংসারের সাধারণ লোকের মত চলাফেরা করিতেন এবং সংসারের সুখদুঃখের অংশীদার ছিলেন।

সংসারে অর্থের অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জন মানসে নোয়াখালী শহরে যাইয়া এক ইঞ্জিনীয়ারের বাসায় পাচকের কাজে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি যখন যে কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেন। ঐ সময়ে একখানা পাকপ্রনালী কিনিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে নানা বিধ মুখরোচক ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সকলের আহার শেষ হইলে, ঠাকুর নিজের আহার্য্য থালায় রাখিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন, ফিরিয়া যখন পাকশালায় আসিতেন তখন আর কেহই সেখানে থাকিত না। তিনি তাঁহার খাদ্য নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ফেলিয়া দিতেন, দুইটি শৃগাল আসিয়া উহা খাইত। তিনি যে আহার করেন না, তাহা বাড়ীর কাহারও বুঝিবার সুযোগ ছিল না। ভোজ্য বিতরণের পর থালাবাটি ধুইয়া তিনি যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন, কিন্তু অনাহারে থাকিলেও তাহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইত না, পূর্ব্ববৎ সবল ও সুস্থই দেখাইত।

কিছুদিন পর প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িলে গৃহকর্ত্তা ঠাকুরকে আর পাচকের কাজ করিতে দেন নাই। তিনি তাঁহার এক ওভারসিয়ারের অধীনে সরকারের কাজে তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া দিলেন, ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা প্রায় সমস্তই মা, ভাই প্রভৃতির জন্য গৃহে পাঠাইতেন।

নোয়াখালীতে আরও কয়েকটি ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহার কিছু কিছু বিবরণ পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

যতদূর জানা যায় নোয়াখালী শহরে অবিনাশচন্দ্র ময়রা নামে এক মিঠাইওয়ালা সর্ব্বপ্রথম গভীর রাত্রে কয়েকদিন তাহার দোকানের সংলগ্ন কালী বাড়ীতে ঠাকুরের বিভূতি অতি গোপনে লক্ষ্য করিয়াছিল, ঠাকুর যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে তাহার দৃঢ়বিশ্বাস হওয়ায় একদিন রাত্রে তাহার মুক্তির উদ্দেশ্যে সে ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল, ঠাকুর তাহার করুণ ক্রন্দনে ও প্রার্থনায় তাহাকে নাম বা দীক্ষা দিয়াছিলেন,——আমি বাল্যকাল হইতে নোয়াখালিতে এই ঘটনার বিষয় বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি।

নোয়াখালী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ওয়ার্ক সরকারের ( P. W. D' র ) কাজে ফেনীতে বদলী হইয়া গেলেন, সেখানে ও ক্রমে তাঁহার নানা বিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ায় এবং তাঁহার দর্শন লাভের কামনায় দলে দলে লোক আসিয়া ভীড় করিতে থাকায় ঠাকুর চাকুরী ত্যাগ করিয়া পুনঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিছুদিন তথায় থাকিয়া অনুমানিক ২৮ বৎসর বয়েস তিনি পুনরায় নিরুদেশ হন।

ইহার পর বহু বৎসর তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র ৺সতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, আনুমানিক ১৮৯৭ খৃঃ যখন তিনি কলিকাতা থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদিন কালীঘাটে কালীমাতার উদ্দেশ্যে একটি ছাগ বলিদান মানসে মন্দিরে ফটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাত্রীদের ভীড় এত বেশী ছিল যে, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"সতীন্দ্র"। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন যে, বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট তাহার খুল্লতাত "রাম" তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

আছেন। তাঁহার মনে হইল যেন স্বর্গ হইতে দেবতা তাঁহার অভীষ্ট পূরণের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন, বিস্ময়ে তাহার বাক্য স্ফুরন হইতে ছিল না। ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে চল, পূজা ও বলির সব কিছু ঠিক করিয়া দিব।" ঠাকুরকে দেখিয়া পাণ্ডারা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, সতীন্দ্রবাবুও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন, যথাবিহিত পূজা ও বলিদানে তাঁহাকে আর কোন বেগ পাইতে হইল না।

এই সাক্ষাৎ ঘটিবার ছয়মাস পর একদিন সতীন্দ্রবাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলেন, ঠাকুর ঐ স্কুলের গেটে দাঁড়াইয়া আছেন। সতীন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন —ঠাকুর কেমন করিয়া জানিলেন যে, সেদিন তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এবং সে পরীক্ষার কেন্দ্র হেয়ারস্কুল। তিনি ঠাকুরের পদধূলি লইয়া পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঐ সময়ে ঠাকুর কালিঘাট এক দরিদ্র বৈষ্ণবের কুটীর বাছিয়া লইয়া কিছুদিন গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ঐ সমসাময়িক কালে ঠাকুর কিষণলাল নামক এক মাড়োয়ারীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ঠাকুর কিছুকাল শান্তিপুরে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ঠাকুর তখন সুক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতেন। একই সময় তাঁহাকে কলিকাতায় ও সিমলায় দেখা গিয়াছে।

১৩১০ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে ( ১৯০৩ খৃঃ ) শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী স্বর্গারোহন করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার খোঁজ করিয়া ঐ সময় তাঁহাকে কলিকাতায় কালীঘাটে পাইয়াছিলেন। তাঁহার শত অনুরোধেও ঠাকুর বাড়ী আসিলেন না, চাউল পূর্ণ একটি পিতলের ঘটি তাঁহার হাতে দিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "মায়ের জন্য আমার যাহা করিবার আছে, তাহা আমি এখনেই করিব।" পরে দেখা গেল ঐ ঘটিতে ৭৫৲ টাকা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবৎসর কলিকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি এক দুঃস্থা বর্ষীয়সী মহিলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, ঐ স্থানে থাকা কালে, এক গলিত কুষ্ঠ রোগী ঠাকুরের চিকিৎসা ও শুশ্রুষায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। আরেক বার হুগলী জেলার বাঁশবেড়ে গ্রামে ভীষণ বাতরোগ-গ্রস্থ মরনোম্মুখ একটী বালকের রোগ তাঁহার পিতা মাতার ঐকান্তিক ভক্তিতে বাধ্য হইয়া নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিলেন। বালকটি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোগঋণ সম্পূর্ণ শোধ করার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বহুবৎসর মাঝে মাঝে অসহণীয় কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলির সময় অনুযায়ী ইহা প্রতীয়মান হয় যে ১৩০৩ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১২ সন পর্য্যন্ত ঠাকুর কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তবে সময় সময় অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়াও বাস করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্য ও পত্রাদি হইতে জানিতে পারিয়াছি, যে তিনি কিছুকাল রাজপুতনায় কোন ধনীর গৃহে বাস

করিয়াছিলেন, এবং চিতোরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি গাজিয়াবাদের নিকটে কোন অরণ্যে বহুকাল তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

আনুমানিক ১৩১৩।১৪ বাং সনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসেন, সেই সময় হইতে ১৩৫৬ সন ১৮ই বৈশাখ পূণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বেশী সময় তিনি বাংলা দেশেই কাটাইয়াছেন। সময় সময় আসাম, বিহার ও উত্তর প্রদেশেও ভক্তগনের গৃহে অবস্থান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যদিও সারাজীবনই তপ, জপ, যোগ ইতাদি কর্য্যেই সতত নিযুক্ত থাকিতেন, তিনি তাঁহার ভক্তগণকেও ঐ সকল বিষয়ে ক্ষুনাক্ষরেও জানান নাই। আমার নিজের বিশ্বাস তাহা জানাইলেও আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারীর কোন উপকার হইত না। কারণ, আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যাহা পাইলে আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ অতি দুর্ব্বল জীবের ঐহিক ও পারত্রিক শান্তি ও আনন্দ হইবে, সেই জিনিষই দেওয়ার জন্য তিনি অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছেন। পরমদয়াল ঠাকুর আমাদিগের জন্য সহজতম, প্রকৃষ্টতম এবং প্রত্যক্ষতম সাধনার উপায় সমস্ত শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া এবং আজীবন তদনুযায়ী আচরণ করিয়া আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ত্রিলোকের জাব মাত্রই ঐ সহজ সাধনায় লিপ্ত হইয়া থাকিলে পরিণামে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিবে, ইহা তিনি আমাদিগকে বারংবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ যাবৎ ঐ সাধনার বিষয়ে তিনি আমাকে যাহা বুঝিতে দিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি। কারণ, তিনি আমার ন্যায় তাঁহার তথা-কথিত ভক্ত বা আশ্রিত কয়েকজনের জন্যই মাত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তাঁহার উপদেশ অন্ধ বিশ্বাসে কিছুকাল একনিষ্ঠ ভাবে কেহ প্রতিপালন করিলে, তাহার প্রত্যক্ষফল সেই সাধনা রত ব্যক্তি অচিরেই প্রত্যক্ষ করিবেন বলিয়া আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

যদিও তিনি তাঁহার সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা বা মহাত্ম্য প্রচারের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পর যাহাতে অতি নির্ভরযোগ্য সত্য অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রকাশ হইয়া, যে কোন দেশের যে কোন জাতির ভক্ত মাত্রেরই স্ব স্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়, তজ্জন্য ঐ সকল সত্য প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি।

এ জগতে বহু মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে মায়ামুগ্ধ জীবের মুক্তির জন্য ভগবৎ শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য এবং ভক্তিভাজন। তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ আলোচনায় আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেছি কিন্তু কলিযুগের এবং সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর যে রূপ সম্পূর্ণ ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এ জগতে পরম ও চরম সত্য প্রচার করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তিনি কখনও নিজ প্রয়োজনে কাহারও নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হন নাই, কারণ কোন অভাবের

অনুভূতি তাঁহার কখনও ছিল না। এমতাবস্থায় অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু-ভাবে নানাস্থানে যাইয়া জীবকল্যাণে সকলের গ্রহনীয় যে উপদেশ তিনি দিয়াছেন, তাহা ভগবৎবাণী বা বেদবাণী হিসাবে গ্রহণ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি।

ঐ উপদেশ পালন করিতে কোন বিধি নিয়মের প্রয়োজন নাই, কোন অর্থব্যয় করিতে হয় না, অন্য কাহারও নিকট যাইতেও হয় না। কোন কৃচ্ছ্র সাধনও করিতে হয় না। নিজ বাড়ীতে বসিয়াই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী থাকিয়া, এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া পরম শান্তিতে ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া অবিচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায় বলিয়া ঠাকুর বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার সকলের প্রতি সমভাবের আচরণ ও সকল দেশের সকল জাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর গ্রহণীয় উপদেশাবলীর বিষয় জানিতে পারিয়াই পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কীয় সর্ব্বকার্য্যে আশাতীতভাবে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

তিনি অনেকগুলি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কিন্তু তন্মধ্যে একখানাও নিজের সুখসুবিধার বা স্থায়ীভাবে কিছুকাল অবস্থান করার জন্য নহে, যে কোন দেশের যে কোন জাতির ভক্ত যেন তথায় আসিয়া স্থির, ধীর ও গভীর ভাবে স্বস্ব উপাস্য দেবতার দিকে উন্মুখ হইয়া অবিচ্ছিন্ন, অতি মাধুর্য্যময়, পবিত্র আনন্দ ও শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্যই তিনি ঐ গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, যে কত দিন দেহে থাকিবেন ততদিন

তাঁহাকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াই বেড়াইতে হইবে। আশ্রমে থাকা তাঁহার হইবে না। কার্য্যতও তাহাই হইয়াছে।

ব্যক্তিমাত্রই কোন উদ্দেশ্য লইয়াই নানা কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার থাকার, খাওয়ার পরার কোন বিষয়েই প্রয়োজন থাকা কেহই কখনও লক্ষ্য করে নাই অথচ ত্যাগ এবং পরোপকারই যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁহার বানী আমি এ যাবৎ যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রিবৃত করিয়া এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানা সমাপ্ত করিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর গ্রহণ যোগ্য তাঁহার অমৃতবানী একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়া কিছ কাল তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অচিরেই ব্যক্তিমাত্রই তাহার প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

## শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত পত্রাদি ও তাঁহার বাক্যাবলী সমস্তই একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই সত্য প্রচার করিয়াছে বলিয়া আমি মনেকরি। একদিন যখন তিনি উপস্থিত ভক্তগণকে উপদেশ দিতে ছিলেন, তখন আমার মনে হইল যেন, একই কথা তিনি বারংবার বলিতেছেন। অন্তর্য্যামী ঠাকুর তখন বলিয়া ফেলিলেন "সত্য ত একই", এই কথা কেন বলিলেন তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন কি না জানি না, আমি কিন্তু স্পষ্টই বুঝিলাম যে, তিনি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে, একই পরম ও চরম সত্য যাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া আমরা আনন্দের পথে অগ্রসর

হইতে পারি, বহু কর্ম্ম স্বীকার করিয়া সেই উপদেশই তিনি বারংবার আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন।

তিনি মৌখিক উপদেশ দেওয়ার কালে সকল সময়ই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক শ্রেষ্ঠতম উপদেশই দিয়াছেন। তাহার খুব সামান্যই আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কিন্তু ঐ বাক্যগুলির এমনই আকর্ষণ ছিল যে, বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়াও একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া মনোযোগের সহিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতাম। অতি সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও জ্ঞান বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের কথা শুনিয়াই আমরা অতি মাত্রায় বিস্মিত হই, কারণ আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে তাহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অসীম ক্ষমতাশালী কাহারও মুখে অসীমের তত্ত্ব আমরা কি করিয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম করিব? ঠাকুরের উপদেশ শোনার কিছুক্ষণ পরেই তাহা কাহারও নিকট ঠিক ভাবে প্রকাশ করা মহাবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সুতরাং ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঐ অমুল্য উপদেশগুলি প্রায় লুপ্তই হইয়া যাইবারই আশঙ্কা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় এবং অপ্রত্যক্ষে তাঁহারই নির্দ্দেশে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত বন্ধু শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, সি, আর, এস্, পি, এইচ, ডি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তগণের পত্রের উত্তরে তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত পত্রাংশগুলি, যাহা ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রহণ যোগ্য, তাহা ছাপাইয়া ঐ অমূল্য উপদেশাবলী জীবকল্যাণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। ঐ পত্রাংশগুলি তিনি বেদবানী আখ্যায়

তিনখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রথমখণ্ডের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, —"পত্রগুলি যেমন যেমন আসিয়াছে এবং পত্রাংশগুলি আমি যে পর্য্যায়ে নকল করিয়া গিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে পর পর সাজাইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল। .........পত্রাংশগুলি অবিকল রাখিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি।" বস্তুতঃপক্ষে, তিনি ঐ পত্রাংশগুলিতে কমা, সেমিকোলন ও পরিবর্ত্তন করিতে সাহস পান নাই। এমতাবস্থায় 'বেদবাণীতে' প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত কোন কথা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই, যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অভিনিবিষ্ট চিত্তে ঐ পত্রাংশগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িলে তাহার মর্ম্মার্থ ক্রমশঃ তাহার নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং যত বেশী পড়া যায় ততই নূতন নূতন ভাবের উল্লেখ হইয়া থাকে। ইহাই আমার এবং অন্যান্য অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলিয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি।

'বেদবাণীর' উপদেশাবলী অত্যন্ত গভীরার্থব্যঞ্জক এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত ভাষার প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা হইতে কিছু বিভিন্নতা থাকায় কোন কোন বিজ্ঞ সাহিত্যিক ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐগুলির মর্ম্মার্থ অনেকটা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তাহা পাঠ করিতে বিশেষ আগ্রহ বোধ হয় না। এই কারণেই আমার ধৃষ্টতা হইলেও বেদবাণী বুঝার সুবিধার জন্য উপক্রমনিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বলিয়া ঐ পত্রাংশগুলি যথাসম্ভব বিষয় বস্তু ভেদে বিভাগ করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। পত্রগুলি এমনই ব্যাপকভাবে বিবিধ বিষয়ের সমস্যার নিরাকরণ কল্পে লিখিত যে, তাহার কোন শ্রেণী বিভাগ করাও প্রায় অসম্ভব। তত্রাচ, আমার প্রণীত শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব স্মরণে, নামক গ্রন্থে এই পন্থা অবলম্বন করায় অতি

অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তের এবং যাঁহারা কখনও ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান নাই, এই প্রকার ভক্তের স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এই কারণেই ঐ পন্থা অবলম্বন করিতে এবার অধিকতর সাহস পাইয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া মনযোগের সহিত ধীরে ধীরে কষ্টস্বীকার করিয়া বেদবাণী অংশ পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।

## বেদবাণী

বেদবাণীর ৮০৮ খানা পত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি— 'নাম' পতিব্রতা ধর্ম্ম বা একনিষ্ঠ ভগবৎ ভক্তি, অকর্ত্তাবুদ্ধি প্রারব্ধযোগ, ধৈর্য্য, ভগবান, সংসার ধর্ম্ম ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়েরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জোর দিয়াছেন, 'নামের' উপর। আমরা সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বব্যাপ্ত, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ ভগবানেরই অংশ। কিন্তু প্রকৃতির বেশাবরণে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ লিপ্সায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া এই ভোগায়তন মায়াচ্ছন্ন অভিশপ্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া নানা শোক সন্তাপে দগ্ধ হইতেছি। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য একমাত্র নামই সম্বল— এই বাণী তিনি পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অসংখ্য নামে ভগবানের বিভূতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ঐ সকল নামের মধ্যে যে কোন একটী নামই সর্ব্বশক্তিমান মনে করিয়া যদি অনবরত তদন্মুখ হইয়া থাকার চেষ্টা করা যায় তাহা

হইলে পরিণামে পুনঃ আনন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন আনন্দরসে আপ্লুত হইতে পারা যায়। অতঃপর আর ঐ সত্যধাম হইতে মায়াময় দ্বন্দ্ব বিভাগে পরিপূর্ণ জগতে গতাগতি করিয়া কষ্টভোগ করিতে হয় না। তিনি বলিয়াছেন, যদিও নাম ও নামী একই, তত্রাচ নামী কখনও জীবের ভাগ্য ভোগ বা গ্রহবৈগুণ্য হইতে উদ্ধার করেন না। কিন্তু নামের শক্তি অপরিসীম এবং তাহার আশ্রয়ে ভাগ্য ভোগাদি হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়।

নামজপ করিতে সময় নাই, অসময় নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই, শুচি নাই, অশুচি নাই। যে কোন অবস্থায়ই নাম করা যায়, তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। যত বেশী নাম করা যায় ততই অবিচ্ছিন্ন আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। হেলায় বা শ্রদ্ধায় যে কোন অবস্থায় নাম করিলে কিছু:না কিছু ফল পাওয়া যাইবেই— ইহাই ঠাকুরের উপদেশ।

## "পতিব্রতা ধর্ম্ম বা একনিষ্ঠ ভগবৎভক্তি"

শ্রীশ্রীঠাকুর অনন্যমনা, অনন্যমরণ, পতিব্রতা ধর্ম্ম, একনিষ্ঠ ভক্তি, সাবিত্রীব্রত, কথাগুলি একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ ই তদন্মুখ হইয়া সকল সময় নাম লইয়া পড়িয়া থাকা বা নাম সংকীর্ত্তন। যদি ধৈর্য্যের সহায়তা অবলম্বনে অনিত্য, অস্থায়ী জাগতিক সমস্ত বিষয়ে মন বুদ্ধি ও শরীরাদির বেগ সহ্য করিয়া, ভালমন্দ শান্তি অশান্তি লাভ, লোকসান, সুখদুঃখ্যাদি কিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমাত্র যে নামেই হোক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রতি লক্ষ্য

স্থির করার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অতিক্ষণস্থায়ী-সুখলিপ্সা আদির প্রতি ঘৃণা আসিয়া অতিন্দ্রিয়, স্থায়ী, নিত্য, পরমপবিত্র স্নিগ্ধ ও মাধুর্য্যময় আনন্দ স্ফুরণ হইতে থাকিবে। এমতাবস্থায় দেহত্যাগ করিতে পারিলে আর ভোগায়তন দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বেদবাণীর তৃতীয় খণ্ডের ১০৯ নং পত্রের শেষাংশে ঠাকুর লিখিয়াছেন, "এই সহিষ্ণুতা ভিন্ন এই সংসারের প্রারব্ধ দণ্ড ভোগমোচনের অন্য কোন শক্তি ভগবান শ্রীগুরু আমাকে দেন নাই। যিনি আমার পথে আসিয়া মরিতে পারেন তিনিই সত্য ক্রিয়া পাইবেন, পতিভক্তি ভিন্ন আমি জানিনা।"

## অকর্ত্তা বুদ্ধি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় বলিতেন, সংসারের জীব কর্ত্তা হইয়াই ভোক্তা হয়। "অকর্ত্তা বুদ্ধি স্বভাব, কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি অভাব।" যদি ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া নিজ মন, বুদ্ধি, অহংকার শরীরাদির বেগ সহ্য করিয়া সংসারের উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেক বুদ্ধি অনুয়ায়ী সুষ্ঠুভাবে পালন করার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে, ভগবানই সমস্ত অভাব হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও অহংকারের উপর নির্ভর করিয়া সুখ পাওয়ার আশায় এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে সকল চেষ্টা বা কার্য্য করি, তদ্বারা আমাদের পাশ বন্ধনই বৃদ্ধি হয়, প্রারব্ধের ভোগের একটুও হ্রাস, বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল মায়ারই খেলা মনে করিয়া সর্ব্বতোভাবে "ত্যাগ" করার চেষ্টা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে

ক্রমশঃ ভগবৎবুদ্ধির উদ্দিপন হইয়া আনন্দের স্ফুরণ হইতে থাকে এবং মায়ার মোহিনীশক্তি আর তাহাকে কোন প্রকারে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ বিমুক্ত না হওয়ায় চতুষ্টেদ প্রণয়ণকারী মহামুনি ব্যাসের কঠোর তপশ্চর্য্যায়ও নিঃষ্ফল হইয়াছিল বলিয়া ঠাকুর সময় সময় প্রকাশ করিতেন। সুতরাং আমরা যে একেবারেই কর্ত্তৃত্বহীন এবং সর্ব্ববিষয়ে শ্রীভগবানই কর্ত্তা, এ বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে ভগবৎ ভক্তিও প্রেমের উন্মেষ হয় না।

## প্রারব্ধ যোগ

জীবমাত্রই ভোগায়তন দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ কালে তাহার প্রারব্ধ, প্রাক্তন, অদৃষ্ট বা ভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বব্যাপ্ত ভগবানই এই ভবিতব্যের স্রষ্টা। আমাদের পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল নিয়াই এই ভাগ্য সৃষ্ট হয়। সুকৃতির জন্য সুখ এবং কুকৃতির জন্য দুঃখ হয় বলিয়াই ব্যক্তিমাত্রই চিরজীবন শান্তি, অশান্তি, ভাল মন্দ, লাভ লোকসান ইত্যাদির তরঙ্গে পড়িয়া ভবসাগরে হাবুডুবু খায়। দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর কেহই এই প্রারব্ধফল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধিও জ্ঞানের সাহায্যে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল দুঃখেরই আকর হয়। অতএব সকল সময় প্রারব্ধদণ্ড অকাতরে সহ্যশক্তির আশ্রয়ে ভোগ করিয়া যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য।

ঠাকুর বলিতেন—প্রারব্ধ ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, এবং কঠোর তপশ্চর্য্যাদি দ্বারাও

ভোগ দণ্ড গ্রহণ ব্যতিরেকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় না। অতএব রোগে শোকে কি যে কোনও প্রকারের মনোপীড়ায় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ঋণ শোধ হইতেছে মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সকল অবস্থায় জীব মাত্রেরই ভোগদণ্ড গ্রহণ করা সঙ্গত।

## ধৈর্য্যই ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় বলিতেন, "ধৈর্য্যই ধর্ম্ম"। সকল অবস্থায় সহ্য শক্তির আশ্রয়ে স্থির থাকাই একমাত্র শান্তি পাওয়ার উপায়। যদি প্রারব্ধই আমাদিগের শাসক বলিয়া ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে সকল অবস্থায় ধৈর্য্যধরাও অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। সময় সময় দেখা যায় যে, নেহাৎ আত্মীয় ও অহৈতুকী ভাবে মিথ্যা অপবাদ করে, ঐ অবস্থায় ধৈর্য্যধরা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, আমি পূর্ব্বজন্মে ঐরূপ অন্যায় ভাবে অপরকে নিন্দা করিয়াছি বলিয়াই এই আত্মীয়টি ভগবানের প্রেরণায় আমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ঋণ শোধ করিতেছে তাহা হইলে তাহার প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষের ভাব আর থাকে না, বরং সে অপ্রত্যক্ষে আমার মুক্তির পথের সহায়ক বলিয়া তাহার প্রতি পূর্ব্বরূপ প্রীতির ভাবই জাগ্রত হয়। ভগবৎ উন্মুখ হইয়া নাম জপ করিতে থাকিলে ঐ প্রকার মানসিক অশান্তিতে ধৈর্য্য ধরা অনেক সহজ হয়। ভগবানকে ভুলিয়া ধৈর্য্যধরা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হয় না, সেই জন্যই আমরা প্রায় সময়ই মানসিক অশান্তিতে দুঃসহ বেদনা অনুভব করি, এবং নানা জল্পনা কল্পনায় মনকে বিষাক্ত করিয়া দুঃখের বোঝাই বাড়াইতে থাকি।

## "ভগবান মঙ্গলময়"

ভগবান সর্ব্বব্যাপ্ত, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। কালচক্রের তাড়না হইতে জীবকে রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। প্রাক্তনই সকল করিয়া থাকে, ভগবান ব্যতীত ইহার হাত হইতে ত্রাণের অন্য কাহারও শক্তি নাই। তিনি মঙ্গলময়। কোন অবস্থাতেই তিনি জীবের অমঙ্গল করেন না, যাহা আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল মনে করিয়া এবং এ অমঙ্গল দ্বারা তিনি আমাদের ঋণ শোধ করাইয়া আনন্দের পথে নিতেছেন, ইহা স্বতসিদ্ধ মনে করিলে তাঁহার প্রতি নেহাৎ দুঃসময়েও বিরক্তির ভাব আসিতে পারে না। তাঁহার সেবাই চরম বলিয়া ধারণা করিলে জীবের কোন অভাবও ঘটে না।

## সংসার ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে বা তীর্থাদি ভ্রমণ করিতে বলিতে শুনি নাই। সংসারে থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী, দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই সঙ্গে প্রেম-প্রতিভ হইয়া থাকিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের সেবাও ভগবৎ সেবা বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করিয়া তথাকথিত ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নানাদিকে ছুটাছুটি করা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার ঐরূপ আচরণকে "সঙ্কট বৈরাগ্য" বলিয়া আখ্যা দিতে আমি শুনিয়াছি। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যপালন করিয়া নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দের পথে অগ্রসর

হওয়া যায় বলিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা যেন সংসারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃ ভগবানকে ভুলিয়া না যাই। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুষ্ঠুভাবে যথাসাধ্য সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতেই আমাদের বলিয়াছেন।

সংসারের জীব তাহার জন্মগত স্বভাব বা প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করে সুতরাং কাহারও কোন দোষ নাই, এইভাব পোষণ করিতেই তিনি, উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে বা আচরণে কপটাচারীর কি পাটোয়ারী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি পছন্দ করিতেন না বলিয়া সময় সময় আমার মনে হইত। বস্তুতঃপক্ষে তিনি সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন নিরপেক্ষ শক্তিরূপে বিরাজ করিতেন্। তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আসিত তাহাদের সকলকেই সুখ শান্তি দিতে অনবরত চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও প্রকৃতিগত দোষ দেখাইয়া বা রূঢ়বাক্যে বা ব্যবহারে কখনও মনঃকষ্ট দিতেন না। তাঁহার ঐ প্রকার আচরণ দ্বারা সংসারে থাকিয়া সুখ শান্তি উপভোগের এক অতি বিরাট দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত "বেদবাণীর" পত্রগুলি বিষয় বস্তুভেদে যথাসাধ্য শ্রেণীবিভাগ করিয়া এবং কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া, অন্যগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিব। ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে কোন্ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ কি তাহা বিষয় ভেদে বিভিন্ন পত্র হইতে একই স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের সম্যক হৃদয়ঙ্গম করার সাহায্য করিতে প্রয়াসী

হইয়াছি। বেদবাণীর পত্রগুলি এমনই ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়াছে যে তাহা বিষয় বস্তু ভেদে পৃথক না করিলে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে অল্প সময়ের মধ্যে বেদবাণীর সমস্ত পত্র হইতে বাহির করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণেই ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ করিলাম।

একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভক্তগণের নিকট লিখিত পত্রাংশগুলি একই সময়ে অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে বিষয়টির সমাধান অতি সহজ হইবে, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত পত্র হইতে নিজ অভীপ্সীত অংশ বাছিয়া লইয়া তাহার সার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ-সাধ্য হয় না। এই কারণে একই পত্রসংখ্যা স্থানে স্থানে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নাম কি? নামই সকল পাপ হইতে নিঃস্কৃতি করিবেন। নাম বই আর কিছুই শান্তি দিতে পারে না।

১। "সর্ব্বদা নাম করিবে, নামেই সকল অভাব দূর করে, মনকে স্থির করিয়া দেয়।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৮৫ নং)

২। "প্রারব্ধ ভুঞ্জমানানি গীতাধ্যান পরায়ণা।" সর্ব্বদা নামে পড়িয়া থাকিবে, নামই সত্য, যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম বই আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা নাম করিবে, প্রারব্ধে যাহা আছে হইবে। যাহা ভগবান করেন তাহাই হইবে, চিন্তা করিয়া ফল নাই।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৪৭ নং)

৩। "সর্ব্বদা নাম করিবে, তাহাতে গ্রহবৈগুণ্য মুক্ত হইবে।
(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩০২ নং)

১ম খণ্ড—১০৬, ১১১, ১৭৪, ১৭৫, ২৪০, ২৪৩, ২৪১, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৭৬, ২৮০, ২৮১. ২৮৭, ২৯০, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৫, ৩০৮, ৩১০, ৩২১, ৩২৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪।

৪। "কালচক্রেই সমস্ত ঘটিয়া থাকে..... নাম বই জগতে আর কিছুই ত্রাণের উপায় নাই। নামই সত্য অতএব সর্ব্বদা নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃদয়ে নামের মন্দির মধ্যে সর্ব্বদা সেবা করিবেন। নামের সেবা করিতে করিতে প্রেমের শক্তি ফুটিয়া উঠিবে।"
(বেদবাণী, ২য় খণ্ড ১২৩ নং)

৫। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নাম করিবেন, নাম আর কৃষ্ণেতে অভেদ। সর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবান সমস্ত ঋণ মুক্ত করিয়া ভগবানের নিকট স্থান দিবেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি সমস্ত ভক্তগণকে যেমন করিয়া এই সংসারের দেবদানবের আবর্ত্তন থেকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেইরূপ আপনাকেও এই সংসার তরঙ্গের বন্ধন হইতে ভগবান উদ্ধার করিয়া লইবেন। অতএব নাম নিয়া পড়িয়া থাকুন। নামেই আপনার সমস্ত করিয়া নিবে।"
(বেদবাণী, ২য় খণ্ড ১২৬ নং)

২য় খণ্ড—২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৯, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৮২, ১৯২, ২২১।

৬। "যে কোনরূপ বিপদই হউক না কেন নাম করিলেই সমস্ত শান্তি হইয়া যাইবে এবং নিজেও শান্তি পাইবে।"

(বেদবানী ৩য় খণ্ড, ১৭ নং)

৭। "নাম এবং ভগবান একই পদার্থ, নাম সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিয়া থাকিলেই নাম প্রতিষ্ঠা এবং চৈতন্য হইয়া থাকে। নাম করিতে করিতে ভালই লাগুক, মন্দই লাগুক, নামেই উদ্ধার করিয়া নিবে।"......(বেদবাণী ৩য় খণ্ড, ১২৫ নং)

৩য় খণ্ড—৮, ১১, ১২, ১৩, ৩৩, ৫২, ৫৩, ৬১, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭৭, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১১৫, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৮৫, ১৮৯।

## পতিব্রতা ধর্ম্ম

১। "সত্যকে সেবা করিতে করিতে সতী হয়। পতিব্রতা হইলে কালের হাত হইতে সত্যকে উদ্ধার করা যায়।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৪নং)

২। "পতিব্রতা ধর্ম্ম আচরণে সকল অভাব দূর হইয়া থাকে, পতি সেবায় ভগবানের প্রকাশ হইতে পারে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১১৮ নং)

৩। "সংসার মায়াময়, দুস্তর তরঙ্গ। ইহার উদ্ধারের একমাত্র ভেলা পতিব্রতা ধর্ম্ম, সত্যনারায়ণ ব্রত।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড ২৭৩নং)

৪। "সংসারের চক্রে ভাগ্যবশতঃ লোকে শান্তি অশান্তিময় সুখ দুঃখ তরঙ্গ দ্বারা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতে লোকের অভাব মোচন জন্যই অবিচ্ছন্নে চলিয়া থাকে। এই অভাব মোচন জন্যই সর্ব্বদা পতিসেবা করিয়া পরম পবিত্র চিত্তে নির্ম্মল পতিদেবের চিত্তপরায়ণ হইয়া নিত্য ভগবানের নিকট থাকিতে পারা যায়। নচেৎ অধৈর্য্যাদির দ্বারা তথায় যাওয়ার কোন উপায় লাভ করিতে পারে না। অতএব পতিসেবা করিতে করিতে নিত্য স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা চিত্তের ভ্রান্তি কলুষনাশ করিয়া লইলে ভগবান নাম রুচি প্রদান করেন। অতএব সর্ব্বদা পতিসেবা করিবেন। পতিস্নেহের প্রত্যাশিত হইয়া সর্ব্বদা অহং কর্ত্তাভিমান পতিতে দিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। সংসার মায়া বন্ধন মুক্তির একমাত্র পতিসেবাই ধর্ম্ম।"

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৩১নং)

১ম খণ্ড—১৫, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫৭, ৬০, ১৩৫, ১৫২, ১৫৫, ১৯৯, ২৩০, ২৬২, ২৭১, ৩১৪, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩১, ৩৫৯, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৮৩

২য় খণ্ড—৮২

৩য় খণ্ড—৪৩, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৭৪, ৭৭, ৯৬, ১০৯, ১৬৪, ১৭৯

## অকর্ত্তা বুদ্ধিই নিত্য মুক্তি লাভের উপায়

১। "সর্ব্বদা সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া নাম করিতে থাকিবেন, নামেই শুচি করিয়া উদ্ধার করেন। ভাগ্যবশতঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নাই। সংসারে স্বধর্ম্মই অকর্ত্তা বুদ্ধি, এই বুদ্ধির আহরণে সকল পাপ মুক্ত হইয়া কৃতকর্ম্ম স্থির করে। বুদ্ধি স্থির করিয়া নিত্যানন্দ ধাম প্রাপ্ত হয়। সুখে দুঃখে সমান করিয়া নিত্য আনন্দ থাকে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৯৬নং)

২। "গর্ব্বহারী ভগবান কারো গর্ব্ব অভিমান থাকতে দেন না।

"জীবের ইচ্ছা কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেই ফল ফলে॥"

ইহা মহাজনের বাক্য, অভ্রান্ত।"

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৩৬নং)

১ম খণ্ড—৫২, ৫৫, ৬২, ৬৫, ৭২, ৮৮, ৯৮, ১৩১. ১৩৭, ১৪১, ১৪৮, ১৬৪, ১৯২, ১৯৬, ২৬০, ৩০৪, ৩১৫, ৩১৯, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৫৮, ৩৭১

২য় খণ্ড—১৪, ১৮৯, ২১৮

৩য় খণ্ড—১৬, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৮৬, ১০২, ১১০, ১৬৩

## প্রারব্ধ যোগ

### ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং

১। "ভগবৎ যাহাতে কৃত ক্রিয়া হয় তাহার সম্বরণের শক্তি নাই। সংসার মায়াময় বরাবরই চলিতেছে, মমতাতেই সকল অভাব ঘটে।"
(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৯৫নং)

২। "স্বভাবে প্রাক্তন যাহা আছে সর্ব্বদা ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হইতে নাই। (ভাগ্যং সর্বত্র বলবর্ত্ততে) চিন্তার অসীম শক্তি। যাহা যতদূর চেষ্টার সাহায্যে লাভ করিতে পার তাহাই সন্তোষ লাভে বঞ্চিত হইবে না। যাহাতে কপাল ঠুকিয়া সহিষ্ণুতা আনিতে পার তাহাই ভাল।"
(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১০৫নং)

১ম খণ্ড—১, ২, ১০, ১২, ২০, ২১, ২২, ৩২, ৫৩, ৪০, ৬১, ৭১, ১১৭, ১২০, ১২৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯ ১৫১, ১৬৩, ১৬৫, ১৮৪, ১৯১, ২১১, ২১৬, ২২৪, ২৫৮, ৩০৬, ৩১২, ৩২০, ৩২৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৮৯।

৩। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বদা। অতএব ভাগ্যকে মানিয়া ভাগ্যের অধীন হইয়া চলিলে সকলই সৌভাগ্যশালী হইতে পারে।"
(বেদবাণী ২য় খণ্ড ১৩নং)

৪। "স্ব স্ব ভাগ্যফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, অতএব ভাগ্যকে মানিতে হয়। স্ব স্ব ভাগ্য হইতে লোকে ফললাভ করিয়া থাকে জানিবেন।"
(বেদবাণী ২য় খণ্ড ৩৪নং)

৫। "লোক সকল স্ব স্ব ভাগ্যফল লাভ করিয়া থাকে, ভাগ্যের অতিরিক্ত কেহই কিছু পাইতে পারে না। (ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র)

(বেদবাণী ২য় খণ্ড ৫৪নং)

২য় খণ্ড—৪, ৬, ১২, ২০—২২, ৩১, ৫১, ৫২, ৭২, ৭৮, ৯৪, ৯৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯৫, ২০০, ২০৭

৩য় খণ্ড—১, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪৪, ৫৫ ৭৩, ৭৬, ১২৮, ১৪৮, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৮৫, ১৮৪

## ভাগ্য অনুসারে কর্ম্মভোগ– ভোগ দানে শান্তি। অদৃষ্টচক্রের ভোগমুক্তির উপায়—

১। "ভাগ্যকে মানিয়া ভাগ্যরথে চলিলে সকল ঋণমুক্ত হইয়া পরমানন্দ অবিমুক্ত পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।"

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৭২নং)

১ম খণ্ড—১৪, ৪৯, ৫১, ৭৬, ৯৮, ১৩৭, ১৪৬, ১৫৯, ১৭২, ২০৬, ২১৪, ২১৬, ২১৯, ২২১, ২৩৩, ২৩৬, ২৬০, ২৬৯, ২৯৩, ৩০০, ৩০৩, ৩১০, ৩১৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯৪

২য় খণ্ড—১, ১৫, ২৪, ২৭, ৩৭, ৪১, ৪৫, ৫৫, ৫৬, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ৯৮, ১০০, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১১১, ১১৭, ১৫২, ১৫৬, ১৫৯, ১৭৬, ১৮২, ১৯৪, ২০৩, ২১১

"ভাগ্যবশে ত্রিলোকের ফলাফল ভোগ ঘটিয়া থাকে। তাই যখন যাহা ভগবানের যে ভাগ পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তোষ থাকিয়া সত্যরূপ যাহা নামরূপে এই ত্রিলোকে বিরাজ করেন তাহারই সঙ্গ হইতে ঐ ভোগ মুক্ত ঘটিয়া থাকে জানিবেন।" (৩য় খণ্ড ১৭০নং)

৩য় খণ্ড—৯, ১০, ১৫, ১৭, ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭২, ৮৫, ৮৭, ৯৮, ১০৬, ১০৯, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১৪১, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৫, ১৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮২, ১৮৬, ১৯০

ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতার দ্বারা অভিমানের সত্ত্বাকে মার্জ্জনা করিতে হয়। জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না—কেবল ধৈর্য্য সম্পদের আয় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।

১। "সহ্য করিয়া থাকাই স্বধর্ম্ম, প্রারব্ধেই সকল করিয়া থাকে। সহ্যই মহৎ সুখকর পরিণাম মঙ্গল করিয়া থাকে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৯৭নং)

২। "ভোগের তাড়না সহ্য করাই ধর্ম্ম। সহ্য করিতে করিতে আরোগ্য হইয়া থাকে।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ২১৪নং)

৩। "সংসার বিচিত্র গতি। কখন কি ঘটে কেহই জানিতে পারে না। ধৈর্য্যই সম্পদ, ধৈর্য্যকে কোন রকমে অন্য হস্তে নিতে দিবে না। সর্ব্বদাই সকল বাধা বিষম্বাদকে উপেক্ষা করিয়া ধৈর্য্যের সহায় ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ২৪৪নং)

১ম খণ্ড ৫, ২৪, ৩৫, ৫০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৯, ১৬৫, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৫, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৪, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ৩১১, ৩৫০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৭, ৩৭৯।

৪। "সর্ব্বদা নাম করিবেন, নামকেই অনন্তচিন্তা বলিয়া থাকে। প্রাক্তন সূত্রে নানা উপাধি সংযোগ করিয়া তোলে। তাহার বেগ ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষয় করিতে হয়······কালে সকলই হইবে, কেবল নামই সত্য, নাম বই এ জগতে কিছুই থাকিবে না।" (বেদবাণী ২য় খণ্ড ১১২নং)

দ্বিতীয় খণ্ড—১১১, ১২৯, ২০৮, ২১৭

৫। "লোকের কথায় কি যায়? সত্যের আবরণই রজঃ, তমঃ, একেই ম্লেচ্ছ অথবা ময়লা বলে। সত্য কখনও মলিন হয় না। যে যাহা বলুক, যে যাহা করুক সর্ব্বদাই সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করিয়া সহ্য করিয়া কেবল গুরু স্মরণ করিবে।"

(বেদবাণী তৃতীয় খণ্ড ১৩৪নং)

তৃতীয় খণ্ড—২০, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৯, ১২৬, ১৫৯, ১৮৮

## ভগবান

১। "ভগবানের কর্ম্ম করিতে কোন চেষ্টা করিবার দরকার হয় না। তাঁহাকে পাওয়াই দরকার এই ভাব হৃদয়ে জন্মিলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বেদ বিধিতে পায় না।" (বেদবাণী প্রথম খণ্ড ১৪২নং)

২। "সংসার মায়াময়, সময় তুর্দ্দিন, নানান ভাবেরই অভাব। এইজন্য ভগবানের স্মরণ নিয়া সর্ব্বদা মনকে, বুদ্ধিকে বাসনাকে শোধন করিতে যত্ন থাকাই জীবভাবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সর্ব্বদাই ভগবানের অধীন হইতে চেষ্টা করিবে।" (বেদবাণী প্রথম খণ্ড ২০১নং)

১ম খণ্ড—৪৭, ৮০, ৯০, ১০২, ১০৪, ১০৭, ১১১, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৭, ১৪০, ১৪৯, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ১৬২, ১৬৮, ১৭০, ২০৯, ২১০, ২১১, ২২৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৪৮, ২৬০, ২৬১, ২৭০, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৭, ৩০৬, ৩০৯, ৩২১, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৬২, ৩৭২, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৪।

৩। "সত্যনারায়ণকে ভুলিবেন না। তাঁহান কৃপায় এই মরভূম হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগ্যানুসারে জীব দেহ, গেহ, সমাজ পাইয়া থাকে। কর্ম্মেরই অধিকার, জীবের ফলের অধিকার নাই। ফলদাতা সত্য জানিবেন।" (বেদবাণী ২য় খণ্ড ৪৯নং)

২য় খণ্ড – ১, ৫, ৭, ২৩, ৩৯, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১২৭, ১৪১, ১৪৫, ১৬২, ১৫১, ১৮৫, ১৫৩, ১৮৩, ১৮৭, ২০২, ২০৯, ২০৫।

৪। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং। ভগবান সকলকেই সমান দেখেন, কাহার কোন দোষ গুণ দেখেন না। প্রারব্ধই ভোগের উদয় অস্ত করিয়া থাকেন। সত্যনারায়ণকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি ছাড়া জগতে বন্ধুবান্ধব কেহই নয়।" (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৬৮নং)

৩য় খণ্ড—১৮, ৩৯, ৮১, ৮৫, ৮৯, ৯৩, ১০৬, ১২৪, ১২৮, ১৮৫, ৩৪, ৮১, ৮৪, ১২০, ১৪১, ১৫১।

## সংসার

১। "সংসার শব্দটিই অভাবের স্মারক, যাহাতে মনের সুখ দুঃখ উদয় হয় তাহাই সংসার।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৮নং)

২। "সংসার মায়াময়। বাজে চিন্তা করিয়া সময় কাটায়, তাহাই বন্ধন। নিরপেক্ষতার সহচর হইলে শোক, দুঃখ প্রারব্ধের দণ্ডাদি ও ভোগের যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃতি পায়।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ৭৩নং)

৩। "সর্ব্বদা ধীর হইতে হয়। ধীরের অভ্যাসেই সংসার ত্রাণ পায়।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ৯৩নং)

১ম খণ্ড—৬, ১৮, ২৭, ৩০, ৯২, ১০১, ১১২, ১২২, ১৩৬, ১৪৩, ১৬০, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৮২, ২১৩, ২২১. ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৩, ২৮৬, ২৯৪, ৩০০, ৩০৯, ৩১০, ৩২৪।

৪। "সংসার কেবল মায়াময়, ভ্রান্তমুগ্ধ। এ জগতে সুখদুঃখাদি লাভ লোকসান প্রাক্তন বশতঃই ঘটিয়া থাকে। সেই প্রাক্তন ভোগের জন্য আপনপর ভাবে শত্রুমিত্র জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হইতে উদ্ধারের একমাত্র ভগবানের সেবা বৈ আর কিছুই নাই। যেই নাম, সেই ভগবান। এতএব সর্ব্বদা নাম করিলে ভগবানের নিকট থাকা হয়। সর্ব্বদা ভগবানের নিকট থাকিলে কোন অভাব হয়না, যেহেতু ভগবান আনন্দময়, সুখময় বলিয়া খ্যাত আছেন।" (বেদবাণী ২য় খণ্ড ১২৪নং)

২য় খণ্ড—৬৭, ১২২, ১২৫,২২৪।

৩য় খণ্ড—১১০, ১৮৭।

## রোগে, শোকে ও নানা মনঃপীড়ায় সান্ত্বনা

১। "সংসারের কালের চক্রেতে সততঃই ক্ষয় হইতেছে, ইহা স্বাভাবিক, এইজন্য লোক সন্তাপ না করিয়া কেবল নাম করিয়া সংসারের কালের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবে। এই নাম ছাড়া এই পুত্র কলত্রাদি যাহা সকলি প্রারব্ধ। এই ভোগশেষের একমাত্র নামই সত্য, কেবল ধৈর্য্য ধরিয়া ঐ নামে পড়িয়া থাকিবে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ২৫৪নং)

১ম খণ্ড—২৮, ৯৫, ২২২, ২২৪, ৩০১।

২য় খণ্ড—৮৪, ৮৬, ১৬০, ১৬৭, ২১২।

২। চিরস্থায়ী এই দেহ নহে বলিয়াই ইহাকে মরভূম বলিয়া থাকে। কেবল আগমপায়ী [ ? ], আসে আর যায়, স্থিতি নাই। এই জন্য জন্ম মৃত্যুর জন্য দুঃখ না করিয়া নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ হইলেই আর এই মর ভৌতিক জগতে [ ? ] জনম মরণের অধীন হয় না, মুক্তিপদ লাভ করিতে পারে। যখন যাহার সময় হয় তখনই তাহাকে এই দেহ জ্বরাপিণ্ড ত্যাগ করিতে হয়।"

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১২৭নং)

"সর্ব্বদা ধৈর্য্যসহকারে নাম করিবেন। নাম করিতে করিতেই আপনার মনে শান্তি আসিবে। এক নাম ব্যতীত মনে শান্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই।······সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিবেন এবং নাম করিবেন, তবে আপনার মঙ্গল আসিবে।" (৩য় খণ্ড ১২নং)

"যে কোনরূপ বিপদই হোক না কেন নাম করিলেই সমস্ত শান্তি হইয়া যাইবে ও নিজেও শান্তি পাইবেন।" (৩য় খণ্ড ১৭নং)

৩য় খণ্ড—১২, ১৭, ২৩, ৩২, ৪২, ৭৫, ১১২, ১৪৪

## জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ

১। "বিবাহ করিলে সংসার বন্ধন হয় না আসক্তিই বন্ধন করে। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং, এই শ্রুতি বাক্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সকলেই বিবাহ সংসার পালন করিয়াছেন।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ৫৩নং)

২। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ভাগ্য হইতেই লোকে ফল পাইয়া থাকে। অতএব জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইহার কর্ত্তা ভবিতব্য জানিবে। যেখানে যে আচারে যাহা ঘটিবে তাহা সেই ভাবেই ভবিতব্য করিয়া থাকেন। ইহার ব্যতিক্রমের কাহারো শক্তি নাই।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৩৪৮নং)

১ম খণ্ড—৩৫১, ৩৪৬, ৩৫২

২য় খণ্ড—১৫, ৯০, ৯৯, ১০০, ১৪২, ১৫৭, ১৫৮, ১৮০, ১৯৬, ২০১, ২০৪।

৬। "বিবাহাদি কার্য্য ভবিতব্যই করিয়া থাকে, কাহারও কোন বাধা কি বিধি দিবার অধিকার নাই।" (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৪৫নং)

৩য় খণ্ড—১৪, ৬৭, ১১১ ১১৪, ১৮১

## কোন প্রার্থনা করিতে নাই।

১। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। প্রার্থনাই বন্ধন জানিবেন। সত্যনারায়ণ সর্ব্ববিধ শান্তিদাতা। তাঁহাকে ভুলিয়া অহংকারের আশ্রয়ে পড়িয়া অভাব সাগরে উর্দ্ধ অধঃ গতিতে বন্ধন হইতেছে। অতএব সেই সত্যদেবের অধীন হইয়া তাঁহার পূজা পাইতে পারেন।"

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১১৬নং)

১ম খণ্ড —১৪৯।

৩য় খণ্ড—৬৪, ১৭১, ১৮৮।

## কাহারো দোষ নাই, সকলি প্রারব্ধ মাত্র

১। "না লইবে কারো দোষ, না করিবে কারে রোষ। সততঃ ই কৃষ্ণব্রত লক্ষ্য রাখিবে। কৃষ্ণদাস নিত্যমুক্ত।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৭১নং)

২। "নিরপেক্ষ থাকাই মঙ্গল। যে যেমনই করুক তাহার দোষ লইতে নাই। যে যা করে সকলি গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া করে, কাহারো কোন শক্তি নাই।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ২৪৬নং)

১ম খণ্ড – ৪৩, ১১০, ১৯৫, ২০৪, ২২৫, ২১৩, ২৩২, ২৩৭, ২৩৯, ২৫০, ২৬৩।

২য় খণ্ড—২০, ৭৭, ১৫৫, ১৯৭, ২১৫।

৩য় খণ্ড—৬৮, ১০৬, ১৫৬, ১৭৭।

## গুরু

১। "গুরুর কার্য্য সর্ব্বদা করিতে চেষ্টা রাখিবেন। গুরুই বিপদ ভঞ্জন করিয়া সম্পদ দিবেন। (বেদবাণী ১ম খণ্ড ৭৮নং)

২। "মনকে সর্ব্বদা সবল রাখিবেন। মন স্থির হওয়া মাত্রই ভগবৎপদ সাক্ষাৎ হয়। বাসনায় মনকে চঞ্চল করিয়া ফেলে, শান্তি অশান্তি তাহাতেই হয়। সর্ব্বদা গুরুর উপর ভার দিয়া সংসার চালন কার্য্যেতে থাকিবেন। সময় করিয়া গুরুই উদ্ধার করিবেন।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৮৯নং)

১ম খণ্ড—৬, ২৭, ৮৪, ৮৬, ৯১, ১২১, ১৫৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৯; ৩০৯, ৩১৩

২য় খণ্ড—৮২, ২১৫, ২২৯

৩। "জীব কখন বন্দী থাকিবে না; তবে প্রারব্ধের ভোগ ভোগের দ্বারা জীবের কাটাইয়া নেয় এই গুরুর নিত্য স্বভাব; অবশিষ্ট ভোগ থাকিতে দেয় না। (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৫১নং)

৩য় খণ্ড—৪১, ১৩৭, ১৫০, ১৫২, ১৭৯, ১৮৯

সকল ভার দিয়া প্রারব্ধ চর্য্যায় ব্রতী থাকিলে গুরুই সকল বিষম সম্পদ, বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৬নং)

"যথাসাধ্য ভগবৎ চিন্তা করিতে হয়, সকল ভার গুরুবে ন্যস্ত করিয়া উপস্থিত সংসারের প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা, যাহা আছে সাধ্য অনুসারে করিয়া যাইতে হয়, কোন বিষয়ে অধিক হর্ষ, বিষাদ করিতে নাই।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ৭নং)

"ভগবানের উপর সকল ভার দিয়া কার্য্য করিয়া যাইবেন, প্রারব্ধ ভোগ কেটে যাবে।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ৬৯নং)

১ম খণ্ড—১৬, ৪২, ৪৪, ৭১, ৭৬, ৭৯, ৮৩, ৯২, ৯৬, ৯৯, ১০৩, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১৫৯, ১৬২, ১৮৫, ১৮৯, ২০৫।

২য় খণ্ড—১৯৯

৩য় খণ্ড—১৮, ২০, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭২, ৭৬, ৯৮, ১১২, ১২২, ১৪১, ১৪৭, ১১৫

"কে আপন? ঘুমের মধ্যে থাকিতে যিনি থাকেন তিনিই আপন, যাঁহারা থাকেন না, তাহারা পর জানিবেন।"

## সত্যং পরম ধীমহি

"ভগবান যাহা করেন কোন ভাবনা করিবে না। সত্যই পরমপদ, সত্যকে ত্যাগ করিবেনা ; সর্ব্বদা মনকে সত্যপথে রাখিতে চেষ্টা করিবে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৮০নং)

"সংসার মায়াময়। সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যকেই সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকিলে, সত্যই আপন শক্তির দ্বারা সুখ, দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া লয় ( সত্যং পরম ধীমহি, সত্যমেব কেবলম )। সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার চেষ্টাই পরম পবিত্রযোগ। ধর্ম্ম পরম পবিত্র রসবিন্দ।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৯৪নং)

"সর্ব্বতোভাবে সত্যলোকে সত্যপরায়ণ হইয়া সত্যভাবে থাকিতে সততঃ চেষ্টা করিবে।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ২৫৬নং)

"সত্যং পরম ধীমহি ; সত্যই পরম পদার্থ জানিবেন।"
(বেদবাণী ২য় খণ্ড ৪৪নং)

২য় খণ্ড—৩০, ৩৩, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৭—৬১, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৮১, ৮২, ৯৪, ৯৬, ১০৫, ১১০, ১৪১, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯—১৬১, ১৭৯, ১৯৮, ২২০, ২২২

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ভগবান সকলকেই সমান দেখেন ; কাহার কোন দোষ গুণ দেখেন না। প্রারব্ধই ভোগের উদয়অস্ত করিয়া থাকেন ; সত্যনারায়ণকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি ছাড়া বন্ধু, বান্ধব কেহই নয়।" (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৬৮নং)

"সত্যং পরম ধীমহি ; সত্যের কম্প নাই, অসত্যের অর্থাৎ অস্থায়ীর স্থিতি নাই ; সত্য ধীরা, স্থীরা, গম্ভীরা, তাঁহান স্মরণে ত্রিলোকের ঋণ পরিশোধিত হয় জানিবেন। (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৭৬নং)

৩য় খণ্ড—৭, ১৮, ২৫, ৪৫, ৭৮, ১৪৭, ১৫৮, ১৭৩, ১৮৭

জীব কেন বাসনাজালে আবদ্ধ হয়—জীবের দুঃখের কারণ—বন্ধন মুক্তির উপায়। ভুয়. ভুয় জন্ম, মৃত্যু কেন হয়।

"এই সংসার মায়ামুগ্ধ, মায়ামৃগে আকৃষ্ট হইয়া বাসনা জাগিলে চঞ্চলতা ঘটে। তাঁহার স্মরণ মাত্রই ভ্রমশোধন হইতে পারে, পুনরায় মায়াজালে বদ্ধ হয় না।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড ৩০ নং)

"সংসার মায়াময়, সকলই অস্থায়ী, সম্পদে মাতিয়া হিতাহিত পরিচর্য্যাশালী হইয়া নানান অভাবের সৃষ্টি করিয়া তোলে, সর্ব্বদাই অভিমানের দ্বারা আহত কণ্টক গলায় বাঁধিয়া লয়।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১১৪নং)

"সংসার কেবল ভ্রান্তিপাশে বন্ধন হইয়া সত্যব্রত, পতিব্রতা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ত্রিলোক চরাচর প্রকৃতির দাসত্ব করিয়া চির কূপে ডুবিতে থাকে।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৬৯নং)

১ম খণ্ড—১৭, ২৭, ৪৬, ১১৩, ১৩২, ১৯২, ২৯১, ২৯২, ৩০৭, ৩২৪, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩।

"সত্য অংশে পড়িয়া বেশাবরণের নানান বর্ণে রঞ্জিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃতির তারতম্যতালাভে শরীরাদি ( ? ) সমাজীয় বন্ধু বান্ধবের সংমীলন ঘটিয়া, প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া ননারূপ শান্তি অশান্তি ভোগ করিয়া সুখ দুঃখের অংশী করে। অতএব স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে এই প্রকৃতি বন্ধন কাটিয়া পুনরায় সত্যপদ লাভ করিতে পারে।" (বেদবাণী ২য় খণ্ড ১৮১নং)

২য় খণ্ড—৩, ৫, ১১, ১৪, ১৮, ৪২, ৬০, ৭১, ৯১, ১১৯, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৪, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৯, ১৮১, ২১৯, ২২০, ২২১।

"বর্ত্তমানে সংসারের চক্রে প্রাক্তনদত্ত ভোগের তরঙ্গ চলিতেছে এই ভোগ চিরকালের জন্য থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের নামের সঙ্গ করিবেন। ভগবানই উদ্ধার করিবেন। অদৃষ্টচক্রের ভোগ একমাত্র নামই মুক্ত করিতে পারে।"

(৩য় খণ্ড ৯নং)

৩য় খণ্ড—৩, ৬, ১৬, ১৮—২০, ২২, ৩৩, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৭২, ৭৫, ৮৩, ৮৬, ৯০—৯২, ১১২, ১১৪, ১২৯, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০।

## সেবা

"সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেই মলিন সঙ্গ মার্জ্জিত করিবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহাতে করিতে পার, তাহার প্রতি যত্ন করিতে ভুলিবে না। গুরুই সকল অভাব মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিবেন।"

(১ম খণ্ড ১৭৪নং)

১ম খণ্ড—১০১, ১১২, ১৪২, ১৬০, ১৭৪, ১৭৫, ২৫৭, ৩০৯, ৩২৭, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৭।

"ভগবানের সেবা পরিচর্য্যাই ধৈর্য্য ধরিয়া নামের নিকট সর্ব্বদা থাকা। যেই নাম সেই ভগবান।......ব্রজবাসীর কোন কর্ম্মে বেদ

বিধির প্রয়োজন হয় না। ভগবানের নিকট থাকিলে কোন অভাবও হয় না।.........অতএব সর্ব্বদা নামের আশ্রয় নিয়া যথাসম্ভব সকল কার্য্য করিয়া যাইতে হয়।”

(২য় খণ্ড ৯০নং)

২য় খণ্ড—৭৫, ৮২।

“ভগবানের কৃপায় লক্ষ্যে সর্ব্বদা থাকুন। অন্ধকারে চলিতে হইলে একটা আলো নিয়া চলাই কর্ত্তব্য।” (৩য় খণ্ড ৯৩নং)

## ধর্ম্ম

“গুরুর কৃপাই সত্য। সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্য অনুশীলনে থাকিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম। মায়ের পুত্র হইয়া থাকিতে অভিমানী হইবে। মাতাই সকল অভাব দূর করিয়া সংসার সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন, সংশয় নাই। (বলং বলং ধর্ম্ম বলং।) পূর্ণানন্দময়ী মাতার কটাক্ষ পাইতে তাঁহারই অনুগত থাকিতে হয়।”

(১ম খণ্ড ১৭৬নং)

“সর্ব্বতোভাবে সত্যলোকে সত্যপরায়ণ হইয়া সত্যভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে।” (১ম খণ্ড ২৫৬নং)

“সংসার মায়ামুগ্ধ হইয়া জীবের শুভাশুভ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া শান্তি অশান্তি দণ্ডে দণ্ডী হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ভগবানের নিকট থাকিতে চেষ্টা করাই জীবের মোক্ষ ধর্ম্ম।” (১ম খণ্ড ৩০৮নং)

১ম খণ্ড—১৪০, ১৫০, ১৫৪, ২১৬, ২২১, ২৫৫, ৩২৮।

"এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম সার জানিবেন। বেদ বিধির আচরণে ভগবৎ প্রীতির বাধক হইয়া থাকে। স্বভাবের সহচরই ভগবান। অভাব সহচর ভগবানের মায়া হইয়া থাকে।"

(২য় খণ্ড ৬৭নং)

২য় খণ্ড—৯২।

"কোন চিন্তা করিবেন না। কালেই সকল সুফল ফলে। অনন্যচেতা কর্ম্মই জগত মুক্তকারী। সংসার মায়াময় নিত্য অনিত্য দ্বন্দ্বজে পরিণত। চক্রবৎ পরিক্রম সুখের দুঃখের খনি। এই অনিত্যকর অসুখকর সংসার হইতে নিস্কৃতি লাভই ভগবৎ ইচ্ছা। তারই দাস হওয়াই ধর্ম্ম।" (৩য় খণ্ড ১২২নং)

৩য় খণ্ড—২৩, ৫৯, ৭৪, ৯২, ১১৭, ১২৮, ১৭৫, ৯৭৯।

## দেহ ও দেহী

"এই শরীর গুরুর। তিনি যাহা করিবেন তাহার অন্যথা কে করিবে? সংসার মায়াময় ভ্রান্তিজনক। যাহাতে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায় হয় তাহাই করা প্রয়োজন।"

(১ম খণ্ড ৯৭৭নং)

১ম খণ্ড—২৮, ১৪৫, ১৬৩, ২৭৭, ২৯৮, ৩৭১। ২য় খণ্ড—৭৩।

৩য় খণ্ড—৪, ২১, ৫৪, ৭৪, ৭৫, ৯১, ৯৫, ১০৬, ১২৭, ১৬৩।

## মন ও প্রাণ

১ম খণ্ড—৬৪, ৮০, ৮৫, ৮৯, ৯২, ১৫, ২৭২, ২১৫, ২৮৭, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৫৭, ৩৬৪।

"( ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ) ভাগ্যকে মান্য করিলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবৎপদ ছাড়া হয় না। কারণ প্রাণরূপে সকল জীবের নিকটেই আছে, দূরে থাকে না। তাঁকে ভুলিয়া মনের অধীন হইয়া পাশবন্ধনে ঘুরিতে থা:কে। সত্যকে না পাইয়া অস্থায়ী অসত্যরূপে আটকাইয়া পড়ে, সত্য যে সঙ্গে সঙ্গেই আছে তাহা জানিতে পারে না। অতএব প্রাণের অধীন থাকিতে চেষ্টা করুন। প্রাণই শান্তি ভবন, মনই অশান্তির আলয় জানিবেন।" (২য় খণ্ড ১১নং)

"মনের দ্বারা জীবের দুঃখের ভাগ হইয়া থাকে।

২য় খণ্ড—৬৮, ৭০, ৭৬, ১২০, ১৩২, ১৪৩, ১৪৪, ১৬৬, ১৯০, ২০৫, ২১২, ২১৩, ২১৭, ২১৯।

৩য় খণ্ড—১৩, ১৯, ২০, ৯০, ৯২, ৯৬, ১৭১, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৫।

## পুরুষকার-

"জীবের কোনই শক্তি দ্বারা কোনরূপ কার্য্যক্ষম- হয় না। কেবলমাত্র ভগবৎ শক্তিতেই জগৎ চলিতেছে। ইহাই প্রারব্ধ, অজ্ঞানতাবশতঃ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সংস্কার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রারব্ধ হইতে যাহা উপস্থিত ঘটনা ঘটিত হয় তাহা ভোগ মাত্র।

ফলাফলের তরঙ্গে বিচলিত না হইয়া সর্ব্বদা প্রাক্তন কর্ম্মে প্রবহন দিতে থাক, ভগবান কৃপা করিয়া সংসার তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।" (১ম খণ্ড ১৭২নং)

১ম খণ্ড—৬৩, ১০২, ১৭৮, ২৫৮, ২৯৫।

"গর্ব্বহারী ভগবান কারো গর্ব্ব অভিমান থাকতে দেন না।

"জীবের ইচ্ছা কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেই ফল ফলে॥"

ইহা মহাজনের বাক্য, অভ্রান্ত।" (৩য় খণ্ড ১৩৬ নং)

৩য় খণ্ড—১৫৩, ১৫৪।

## গতস্য শোচনা নাস্তি

১ম খণ্ড—১৫৬ নং।

## চিন্তা করা ভ্রান্তি

"কোন চিন্তা করিবে না, সর্ব্বদাই গুরুচিন্তা করিবে।"

(১ম খণ্ড ১৮৩)

"চিন্তা ভাবনা করিয়া ফল নাই, অদৃষ্টে যাহা হইতেছে, তাহাই হইবে। সহ্য করিয়া লইতে হয়।" (১ম খণ্ড ২০৩নং)

"চিন্তা করিয়া ফল কি হইতে পারে? অদৃষ্টচক্রে সকলে ভোগের পাশে বদ্ধ থাকিয়া শান্তি অশান্তির তরঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল চেষ্টা করিয়া যাইতে হয়, ফলাফল অদৃষ্ট।" (১ম খণ্ড ২০৭)

২য় খণ্ড—১৯০, ২৪৮, ২৫৮।

"অদৃষ্ট ফলের দরুণ হর্ষ বিষাদে না জড়াইয়া এই জড়তা মুক্তের জন্য সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে হয়। এ জগতে যাহা কিছু ঘটে সকল ভাগ্যেই হইয়া থাকে। তাহার জন্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে নাই। সর্ব্বদাই নাম করিবেন। চিন্তা ভাবনা করিয়া কিছুইতো করিতে পারেন না।...ভগবানই চালানের কর্ত্তা, জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।"

(৩য় খণ্ড ১০২ নং)

"কোন চিন্তা করিবেন না। সর্ব্বদা ভগবৎ অধীন হইয়া থাকিতে চেষ্টা রাখিবেন। সংসার মায়াময়, প্রারব্ধ ভোগের অন্ত হইলেই শান্তি হয়। প্রারব্ধ ভোগের জন্য বিচলিত হইতে নাই।"

(৩য় খণ্ড ১১৮নং)

৩য় খণ্ড—১১০, ১১২, ১১৪, ১২২।

## "নিরপেক্ষ থাকাই পরম পথ"

১ম খণ্ড—৭৩, ৮৮, ১০২, ২৮৯।

৩য় খণ্ড—৩৩, ৪৬, ৬৯।

## পিতৃ মাতৃ ভক্তি

১ম খণ্ড—১০১, ২২১।

২য় খণ্ড—১৩২।

৩য় খণ্ড—৬।

## দেহত্যাগ

"কালচক্রের প্রাক্তন আদি ভোগের অবসানে দেহ বিচ্ছেদ হইয়া আছে……… ।" (১ম খণ্ড ১৫১নং)

১ম খণ্ড—৩৭১ ।

৩য় খণ্ড—২১, ২২, ৪৩, ৬৩, ৯১ ।

## অভ্যাস যোগ

"কোন চিন্তা নাই অভ্যাস যোগে থাকিতে থাকিতে মনের গ্লানি দূর হইয়া দেহ, মন, চিত্ত ভাব সকল পবিত্র লাভ করিয়া পরম শান্তি পাওয়া যায়। নাম চিন্তামনি কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নাত্মা নাম নামিনঃ।" ( ১ম খণ্ড ৯৪ নং )

'সর্ব্বদা ধীর হইতে হয়। ধীরের অভ্যাসেই সংসার ত্রাণ পায়।' ( ১ম খণ্ড ৯৩ নং )

১ম খণ্ড— ২৩, ৬৬, ৬৮, ৭২, ২১৫ ।

২য় খণ্ড— ১৩২ ।

"ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মেতে বিচরণ করা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় স্থির হইয়া থাকা। আকাশ যেমন কোন বিষয়ে কম্পিত হয় না, আগুনের দ্বারা তাপিত হয় না, অস্ত্রের দ্বারা ভাগ হয় না এই প্রকার চিত্তকে করিবার চেষ্টাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। অতএব সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। ( ৩য় খণ্ড ১৩২ নং )

৩য় খণ্ড— ১৭৮, ১৭৯ ।

### শূন্যচিন্তা

১ম খণ্ড—৩, ১৯।

২য় খণ্ড—১৩৪, ১৩৭, ২০৬।

৩য় খণ্ড—৪২।

১। "যত আড়ম্বর কমান যায় ততই শান্তির উদ্‌যাপনা হইতে থাকে। ভগবান নির্জ্জন, নিভৃত অনাবৃতেই উদয় থাকেন, আবরণ মায়া।"

(১ম খণ্ড ৭৭নং)

### অনুভূতি

"হৃদয়ের অনুভূতি যাহা সকল সুখ বোধ হয় তাহাও ভ্রান্তি। অনন্ত কর্ম্মের দ্বারাই ভগবৎ পরাভক্তি লাভ করে, অনুভূতির মধ্যে নাই।"

(১ম খণ্ড ১৩৮নং)

১ম খণ্ড --১৩০ নং।

### বিবিধ

উৎসব—"উৎ (আলোক) সব (থাকা) দুই সখীগণে উৎসব ঘটনা হইয়া থাকে। দক্ষযজ্ঞের দ্বারা সত্যনারায়ণ দূরবর্ত্তী হইয়া যায়।"

(৩য় খণ্ড ২নং)

জন্মোৎসব—"মনের দাস না হইয়া সত্যে অধীন থাকিতে চেষ্টা রাখুন। সত্যকে পাইলেই........জন্মতিথি পরিমার্জ্জিত হইয়া অজ, নিত্য, শাশ্বতকে লাভ করিতে পারিবেন। একেই জন্ম উৎসব বলে।"

(২য় খণ্ড ২১২ নং)

গীতা—"গীতাখানা টীকা অন্তয় না দেখিয়া ধৈর্য্যভাবে পাঠ করিবেন। তাহাতে অনেক.....বক্তব্য বিষয়কে জানাইয়া দিবে। ঐ

গীতাটি ভগবানের হৃদয়, সন্দেহ নাই। এই শরীরে ভগবান আছেন তাঁহাকে জানিয়া লইতে পারিবেন। তাঁর নিকট সকল চেষ্টা রাখিতে পারিলেই সকল সংসার মুক্ত হয়।" (৩য় খণ্ড ৫০নং)

"অপার করুণাপদ ভগবান সংসারে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।"

( ৩য় খণ্ড ১২০ নং )

"বুঝান যায় সকলকেই, বুঝে না নিজ মন। ( ৩য় খণ্ড ১৩৮ নং )

"মানুষের প্রকৃত অভাব অতি কম, কল্পিত অভাবই সর্ব্বনাশের মূল।'

( ৩য় খণ্ড ১৩৯ নং )

·········কাঙ্গাল হইয়া থাকা ভাল, সকল সময় গুরু চালক হ'ন। ধনীর চালক শয়তান। কাজেই গুরুতত্ত্ব যে অসীম পদ তাহার কাছে যাইতে প্রতিবন্ধক নানা বাসনা, অহংকার, অভিমান, রাগ-দ্বেষ, হিংসা লোভাদি নানাভাবে চালনা করিয়া কুপথে বাসনা বা ধনমান দিয়া বন্ধ করে। অতএব সকল ভার গুরুকে দিয়া [ গুরুর ] কার্য্য যথাযোগ্য মতে করিতে থাকুন। গুরুই সময় করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া লইবেন, ভাবনা নাই।" ( ৩য় খণ্ড ১৪৯ নং )

"যাহা হয় প্রারব্ধ ভোগ, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিতে নাই। সততঃই সহিষ্ণু শক্তির আহরণ করিবে। সাধ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া যাইবে, গোলমালের কোন বন্ধনের কার্য্য করিবে না। অনর্থক উৎপাত টানিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে না। ধার করিতে অভ্যাস করিবে না। ধার করা বড় দোষ। কষ্টে সৃষ্টে সহ্য করিয়া অঋণী থাকাই ভাল।"

( ১ম খণ্ড ২৩১ নং )

নানা প্রশ্নের উত্তর ( ৩য় খণ্ড ৫৮ নং )

## —শুদ্ধিপত্র—

| | |
|---|---|
| ১৬ পৃষ্ঠায় শেষ ছত্রের নিম্নে | নিম্নোক্ত অংশ বাদ পড়িয়াছে ঃ— স্নান করিতে দেখিয়াছে বলিয়াও এ যাবৎ শুনি নাই। |
| ১৭ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রের প্রারম্ভে | তত্রাচ তাঁহার |
| ৬৯ পৃষ্ঠায় দশম ছত্রের শেষে | প্রকৃতপক্ষে গাড়ী ষ্টেশনে আশা-মাত্র রোহিনী বাবু অন্য কোন কামরায় না যাইয়া সোজা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। |

### ইহা ছাড়া—

| পৃষ্ঠা | ছত্র | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৯৮ | ১০ | উৎসব | বৎসর |
| ১২২ | ৩ | । | — |
| ১২৭ | ১৪ | ঠাকুরের | ঠাকুর |
| ১৩৯ | ২ | বর্ত্তমান | বর্ত্তমানে |
| ১৩৯ | ২১ | দোলমহত | দোলমঞ্চ |
| ১৬৯ | ১৩ | বয়েস | বয়সে |
| ১৭২ | ১১ | ক্ষুনাক্ষরে | ঘূর্ণাক্ষরে |
| ১৭৪ | ২১ | কত | যত |
| ১৭৬ | ১ | কর্ম্ম | কষ্ট |
| ১৮১ | ৪ | নিঃস্ফল | নিষ্ফল |

# শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব স্মরণে

শ্রীশুভময় দত্ত প্রণীত। মূল্য—২·৫০ নয়া পয়সা।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—১/৬০, গর্চ্চা ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা-১৯।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ পত্রিকা "শ্রীসুদর্শন", হিমাদ্রি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কয়েকজন ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মতামত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"লেখক ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত—দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাই তিনি এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুর সম্বন্ধে আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য—কিন্তু এমনটি আর হয় নাই।"

(শ্রীসুদর্শন—ফাল্গুন ১৩৬৬ বাংলা)

"মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও কৃপালাভ বহু জন্মের সুকৃতিরই ফল। গ্রন্থকার সেইরূপ একজন সুকৃতিবান পুরুষ। তাই তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের অযাচিত করুণার অমৃত বরিষণ। তাঁহারই বিস্ময়কর কাহিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংসার তাপদগ্ধ নরনারী এই গ্রন্থ পাঠ করুন—পাঠে হৃদয়জ্বালা বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইবে, এমন কথা অবশ্যই বলা চলে।"

(শ্রীসুদর্শন—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ বাংলা)

"শ্রীরামঠাকুরের মহাজীবনে যোগ ও তন্ত্র সিদ্ধির অসামান্য প্রকাশ দেখা গিয়াছে, অগণিত ভদ্র ও শিষ্য এই শক্তিধর আচার্য্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাই তাঁহার জীবন কথা সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার সীমা নাই। ঠাকুর আপন জীবনকে সদাই প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহিতেন, তাই তাঁহার জীবন তথ্য উদ্ঘাটনে ভক্তেরা গোড়ার দিকে বেশী অগ্রসর হন নাই। সুখের কথা, তাঁহার মৃত্যুর পর ঘনিষ্ঠ মহল হইতে কিছু কিছু স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীশুভময় দত্তের রচিত গ্রন্থখানি ইহাদের অন্যতম।

গ্রন্থকার ঠাকুরের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতার অধিকারী ছিলেন, কাজেই তিনি মহা ভাগ্যবান। এই ভাগ্যবান ভক্ত ও প্রবীন সেবকের মুখে ঠাকুর, ঠাকুরের মণ্ডলী ও স্থাপিত মঠ সমূহের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রদত্ত তথ্যাদির মধ্যে বহু মূল্যবান ও প্রামাণিক উপকরণ ছড়ানো রহিয়াছে। ঠাকুরের ভবিষ্যৎ জীবনীকারেরা ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন।

প্রত্যক্ষ দর্শন ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে লেখক ঠাকুর ও তাঁহার পরিবেশের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সুখের কথা, এ অঙ্কনে অতিশয়োক্তি ও ভাবাবেগের আতিশয্য নাই। আত্মঘোষণার প্রবণতাও ইহাতে দেখা যায় না ভক্ত ও সেবক হিসাবে সান্নিধ্যে থাকিয়া ঠাকুরকে ও ঠাকুরের মণ্ডলীকে যে সহজ আত্মীয়তার দৃষ্টিতে তিনি দেখিয়াছেন, তেমনি সহজভাবে উহা পরিবেশন করিয়াছেন।

রামঠাকুর মহাশয়ের অপরাপর ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা শ্রীযুক্ত দত্তের মত স্মৃতিকথা রচনায় উদ্যোগী হইলে এই দুরবগাহ মহাসাধকের একটি

স্পষ্টতর রেখাচিত্র গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রবীণ ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা এখনো বাঁচিয়া আছেন, ইহা তাঁহাদেরই এক দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার শ্রীদত্ত এই দায়িত্ব বহন করিতে আগাইয়া আসিয়া শুধু ঠাকুরের আশ্রিতদের নয়, অধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইলেন।"

( "হিমাদ্রি"—৯ই বৈশাখ, ১৩৬৭ বাং )

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাচীনতম সহকারী সম্পাদক,—
শ্রীকেশবলাল ঘোষ লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব স্মরণে—দিব্য জীবনের লোকোত্তর স্পর্শ। কি বিশাল ব্যবধান লেখশৈলীর অপূর্ব্ব কৌশলেই নহে, আত্মিক ভাষায় অন্তরে ছোঁয়া দিয়া যায়। যিনি বিরাট ব্যাপক দিগন্তে মিশিয়া যাইতেছেন, ভক্ত-লেখক তাঁহাকে রূপে রেখায় টানিয়া দিলেন, তাহা শুধু আশ্চর্য্যই নহে, পরমানন্দের সম্পদ। তিনি এই দেবজীবনের সংস্পর্শে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সেই মধুময় কাহিনী এই গ্রন্থে রহিয়াছে। ঠাকুরের দিব্য দেহ যাঁহারা দেখেন নাই, মধুর কণ্ঠ যাঁহারা শোনেন নাই, এই গ্রন্থ তাঁহাদের প্রাণে ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিবে। অন্ধকার হইতে আলোর তীরে পৌঁছাইয়া দিবে। রিক্তকে পূর্ণের সন্ধান দান করিবে।"

পণ্ডিত প্রবর শ্রীমোহিণী মোহন শাস্ত্রী, জ্যোতিষ মহা সম্মিলনীর সভাপতি লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীগুরুনিষ্ঠ প্রাণ শ্রীযুক্ত শুভময় দত্ত মহাশয়ের "শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেব স্মরণে" গ্রন্থখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গাভিযানে, আত্মঅভিজ্ঞতা

পরিব্যাপক। এ গ্রন্থপাঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গজনিত বহু তত্ত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। গ্রন্থকার সুরম্য স্মৃতির পরিচয় দ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

গ্রন্থ অচিন্তনীয় বিষয় বস্তুতে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। তদনুপাতে গ্রন্থমূল্য অধিক হয় নাই।

আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ ও সর্ব্বসাধারণ পাঠ করতঃ ঘটনা বহুল বিষয় অবগত হইয়া আনন্দিত হইবেন।"

ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত,— মৌলবী জহুরুল হক,
Senior Accounts Officer,
E. B. Rly., Chittagong, লিখিয়াছেন :—

"রায় শুভময় দত্ত বাহাদুর প্রণীত মহাসাধক ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের জীবন ইতিহাস ও তদীয় উপদেশাবলী পাঠে শুধু যে অনাবিল আনন্দ লাভ করিলাম তাহা নহে বরং যথেষ্ট উপকৃতও হইয়াছি। প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বহিখানির বিষয় বস্তু আমাকে এতই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে সমগ্র বহিখানাই আদ্যোপ্রান্ত এক বৈঠকেই শেষ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। এই মহাপুরুষের মহানুভবতা, চরিত্র মাধুর্য্য, উপদেশের গভীরতা ও নিয়মনিষ্ঠা দেশ কাল ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই যে আকৃষ্ট করিবে ইহাতে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই। জন সাধারণের প্রিয় 'রামভাই' নামটি তাঁহার জীবনে স্বার্থক হইয়াছে। বহিটিতে ঠাকুরের জীবনের প্রত্যেকটি খুটি নাটি ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যই যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য বা অতিরঞ্জন দোষ কোথাও স্থান

পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহিখানা যে সর্ব্বত্র সকল সমাজে সমাদর লাভ করিবে ইহা সুনিশ্চিত। পরন্তু উহা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলে বহু লোক ঠাকুরের উপদেশসুধা পানের সুযোগ লাভ করিবে।"

অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ প্রদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার বইখানা বাহুল্য বর্জ্জিত, সম্পূর্ণ নিজের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আল্‌পনা। পড়িয়া আমি বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। 'বেদবাণী'র abstract গুলি আমাদের মত অনধিকারীদের জন্য হীরকখণ্ড। 'বেদবাণী'র অনেক বিষয় আমার নিকট দুর্ব্বোধ্য মনে হইত। এখনও মনে হয়। কিন্তু out lineগুলি আপনি যেমন আঁকিয়াছেন, আমাদের অনেক উপকারে আসিবে।" —১৪, ৫, ৬০ ইং

"ঠাকুরের লিখিত পত্রাংশগুলি ( বেদবাণী ) বহুবার পড়িয়াছি ও মোটামুটি বুঝিতে পারি এবং আনন্দ পাই। আগে মোটেও বুঝিতে পারিতাম না এবং শুষ্ক মনে হইত।" —১, ১১, ৬০ ইং

চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত অশীতি বৎসর বয়স্ক কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর দাস, এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রীশুভময় দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে" নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ মধুর সাহচর্য্যের বিবরণ তিনি প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়া জগতের মহান উপকার সাধন করিতেছেন।

আমাদের প্রাণের ঠাকুর যে কি ছিলেন. তাহা বুঝিতে পারা অতীব কঠিন। কারণ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনই প্রচ্ছন্ন ও প্রহেলিকাময়। ঠাকুরের বাণী বেদবাণীর মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা দূরূহ।

বর্ত্তমান জগৎ অকর্ত্তাবুদ্ধি, নিরপেক্ষতা ও স্থৈর্য্যধর্ম্মের অভাবে যে মহা প্রলয়ের সম্মুখীন হইয়াছে,...............

......তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজকে এখন একান্ত অসহায় বোধ করিতেছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে যুগাবতার ঠাকুরের শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতের শাশ্বত সত্য বিশ্বধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব মানবতা ঠাকুর যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার উপযোগিতার এখন সময় আসিয়াছে। সে জন্য ঠাকুরের বাণী ও সত্যধর্ম্ম মানব সমাজের প্রতি স্তরে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়া ঠাকুরের আশ্রিত ও লব্ধ কৃপা ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ঠাকুরের অপরিসীম কৃপা ও স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তপ্রবর শ্রীদত্ত মহাশয় এই কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হইয়া জগতের মহা মঙ্গল সাধন করিয়া যাইতেছেন। তিনি একসঙ্গে আচার ও প্রচার.........ধন্য হইতেছেন।

ঠাকুরের বাণী অতীব গভীরার্থ ব্যঞ্জক। শ্রীদত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে উহা বিশ্লেষণ করিয়া চমৎকার ভাবে সহজ বোধ্য করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আপামর সকলেই আমাদের প্রাণের ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া এবং সত্যধর্ম্মের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ঠাকুরের শ্রীশ্রীচরণে প্রার্থনা, তিনি যেন এই সাধক আশ্রিতকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহারই মহাব্রত সুষ্ঠু উদযাপনে সাহায্য করেন।

জয়তু শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।"

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নানা শাস্ত্রবিদ শ্রীঅনন্তবিহারী রায়, কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ বিদ্যালয়ের নিম্ন শাখার প্রধান শিক্ষক লিখিয়াছেন—

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলাম। ভগবানের কৃপায় ঐশিক শক্তি লাভ না করিলে জটিল ও দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয়ের এরূপ সহজ ভাষায় প্রকাশ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান যন্ত্র যুগের স্বার্থ ও হিংসার বিষে জর্জ্জরিত ও বিপথগামী মানবের পক্ষে মরুপথে বিভ্রান্ত পথিকের মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়ার মতই এই পুস্তকখানি নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। ঠাকুরের জীবনী ও বাণীর মধ্যে সত্যই অমৃতের সন্ধান আছে। গীতায় শ্রীভগবানের যে বাণী—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সেই বাণীর সত্যতানুসারেই বর্ত্তমানের ঘোরতর অধর্ম্মের যুগে "ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেবের" যে আবির্ভাব তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পুস্তকখানি পাঠে আমি উপকৃত হইয়াছি।

---